দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পকসোতে অভিযুক্ত আনিসের মৃত্যুতে মুসলিম কোল পেতে চাইছে সবাই— পৃঃ ১১

রবীন্দ্রগানে পূজার নৈবেদ্যে প্রেমের ফুল — পৃঃ ১৩

৭৪ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১৪ মার্চ, ২০২২।। ২৯ ফাল্গুন - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

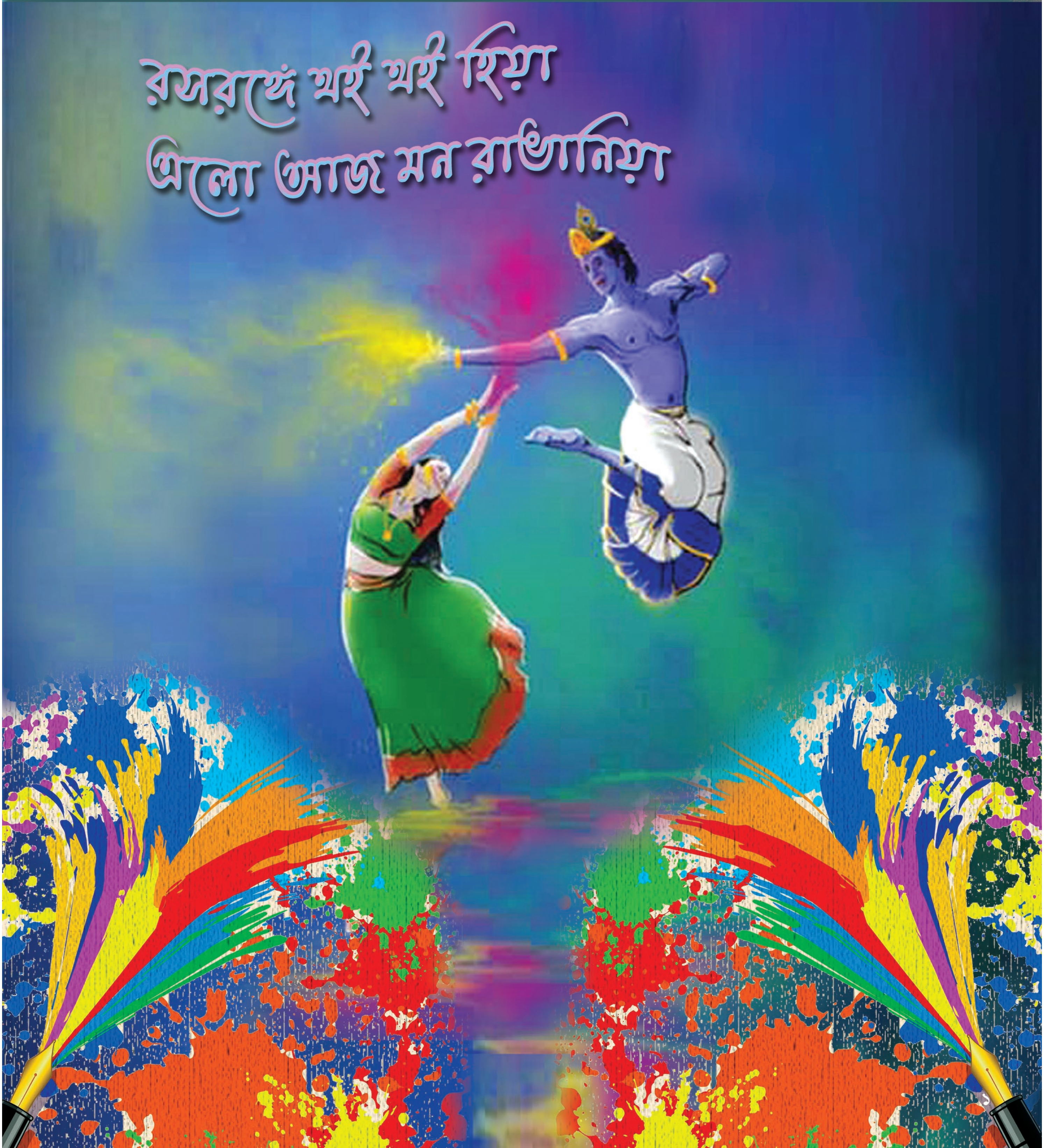

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৪ মার্চ - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

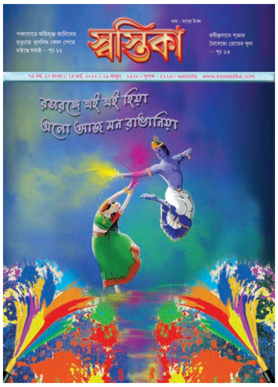

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

কেবল ‘যোগীর জয়’ বাঁচাতে পারে রাজ্য বিজেপিকে
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

থ্যাংক ইউ মোদীজী ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সীমানার বাইরের ডাক্তারি শিক্ষানবিশদের সংকটকাল
◻ ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী ◻ ৮

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ভারতের কূটনীতি
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পকসোতে অভিযুক্ত আনিসের মৃত্যুতে মুসলিম কোল পেতে চাইছে সবাই ◻ সুকল্প চৌধুরী ◻ ১১

রবীন্দ্রগানে পূজার নৈবেদ্যে প্রেমের ফুল
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৩

একান্ত আপন ◻ অনামিকা দে ◻ ১৫

বিষের পেয়ালায় অমৃতপান ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৩

বাঁশিটার একটাই দোষ বলে রাধা রাধা ◻ অগ্নিদীপ্তা দে ◻ ২৬

আকাশে কালো মেঘ নয়নে কালাচাঁদ
◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৮

প্রিয়জনের ফাগে মন রাঙানোর দিন
◻ প্রশান্ত কুমার মণ্ডল ◻ ৩১

শচীমাতার আঙিনা থেকে মানুষের আঙিনা
◻ নিরোদ চন্দ্র শর্মা ◻ ৩৩

হোরিখেলা ◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

বাংলা গানের দুই অমর কথাশিল্পী ◻ রুদ্র সেন ◻ ৩৮

বিশ্বে ইসলামের বিপদ কি আসন্ন? ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৩

ভারত সরকারের ‘দেউলিয়াবিধি’ ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মরণে : ৪৫ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২১ মার্চ
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২১ মার্চ
২০২২

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ভারতের অবস্থান

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে ভারতের অবস্থান নিয়ে অনেকেই নানা প্রশ্ন তুলেছেন। ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় ছাত্রদের দেশে ফেরানো প্রসঙ্গেও নানা মহল থেকে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই যুদ্ধ এবং ভারতের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। লিখবেন— সুজিত রায়, অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শোনো গো দখিন হাওয়া....

ইহা এক অত্যাশ্চর্য সময়। শীতের রুক্ষতা সবেমাত্র বিদায় লইয়াছে। আকাশে-বাতাসে উদার-উদাসীন ভাব। যে সকল বৃক্ষ পাতা ঝরাইয়া রিক্ততার প্রতিমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ডালে ডালে নবপত্রের সমাগম হইয়াছে। শীঘ্রই ফিরিবে তাহাদের ফুল ফুটাইবার দিন। পৌষের ফেলিয়া যাওয়া জীর্ণ পাতার দীর্ঘশ্বাস মুছাইয়া প্রকৃতি আবার সাজিয়া উঠিবে নূতন রঙে। বসন্তের সমাগমে এমন করিয়াই বদলাইয়া যায় প্রকৃতি। মানুষ সচকিত হইয়া প্রত্যক্ষ করে, ট্রেন হিমশীতল অন্ধকারে নিমজ্জিত টানেল পার হইয়া সূর্যকরোজ্জ্বল দিবালোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রকৃতিপূজক দেশ। ঋতু পরিবর্তনের এই মাহেন্দ্রক্ষণটি চিনিতে তাহার ভুল হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতির এই নবীন রূপের সহিত মানুষের পরিচয় তো হইল, মুগ্ধতার আবেশ ছড়াইল হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে — সর্বব্যাপী হইল কী? না, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল কয়েক শতাব্দী আরও।

মহাভারতের যুগে আবির্ভূত হইলেন চিরকিশোর প্রণয়ীযুগল রাধা-কৃষ্ণ। হোলিকা নাম্নী এক রাক্ষসীকে বধ করিয়া কৃষ্ণ হোলি উৎসবের সূচনা করিলেন, অন্যায় অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইয়া খুশিতে উদ্বেল মানুষ পরস্পরকে রং মাখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু সেই আনন্দ সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিছু মানুষের স্বতোৎসারিত আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তখনও হোলির রং উত্তর হইতে দক্ষিণে, পশ্চিম হইতে পূর্বে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ছড়াইয়া পড়িল রাধা-কৃষ্ণের অমর প্রেমগাথার মধ্য দিয়া যখন রাধার পিচকারি হইতে নির্গত গুলালধারায় ভাসিয়া যাইলেন কৃষ্ণ, যখন দেখিলেন রং ধরিয়াছে তাঁহার হৃদয়ে, তাঁহার বাঁশিতে—তখন আর সেই রং আবদ্ধ রহিল না। সে ছড়াইয়া পড়িল যেইদিকে তাহার দুই চক্ষু যায়। ভারতের দরিদ্র হইতে দরিদ্রতম মানুষটিও তাহার পর্ণকুটিরের বিবর্ণ অঙ্গনটি গঙ্গাজলে শুদ্ধ করিয়া তাহাতে আলপনা আঁকিল এবং মন্দিরে যাইয়া দেবতার পায়ে রঙের অঞ্জলি দিয়া বলিল, 'জয় রাধাকৃষ্ণের জয়।' এই জয়ধ্বনিতে উত্তর-দক্ষিণ নাই, উচ্চ-নীচ নাই, ধনী-দরিদ্র নাই। ইহা সর্বব্যাপী। কারণ হোলি বা দোল যত না বসন্তোৎসব তাহার চাইতে অনেক বেশি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ উদ্‌যাপনের দিন।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম যদি মিলনান্তক হইত, তাঁহারা যদি বিবাহ করিয়া ঘর বাঁধিতেন তাহা হইলে বোধহয় ভারতবর্ষ আপন হৃদয়ে তাহাদের এমন গৌরবের আসন প্রদান করিত না। যাহা সাধারণ, যাহা দিবারাত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় না। যুগের পর যুগ ধরিয়া অসাধারণ হইয়া উঠিবার প্রেরণা জোগাইবার ক্ষমতা না থাকিলে তাহার মূল্য মহাকালের মহাজনের কাছে কানাকড়িও নহে। কৃষ্ণের কর্তব্যপরায়ণতা এবং দেশ ও দশের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়া ভারতবর্ষ যেমন মুগ্ধ হইয়াছে, ঠিক তেমনই বিরহদীর্ণ রাধাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় ভারাক্রান্তও হইয়াছে। ঘরের মেয়েটি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনীপ্রায় হইয়া এত কষ্ট পাইয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা কেমন করিয়া ভুলিবে? সে বিরহকাতর রাধাকে স্নেহ দিয়াছে, ছায়া দিয়াছে, হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছে-— এমনকী রাধাকে কাঁদাইবার নিমিত্ত প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে তিরস্কারও করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের এই অপার্থিব লীলায় যুগ থেকে যুগে মহিমান্বিত হইয়াছে হোলি এবং দোল উৎসব।

আরও একটি কারণে দোলের দিনটি বিখ্যাত। মধ্যযুগে এই দিনে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বঙ্গপ্রদেশে তিনি কৃষ্ণনামের বান বহাইয়া দিয়াছিলেন। মহাজন পদকর্তারা বলিয়াছেন, মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে কৃষ্ণপদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক ভারতের পূজায়, প্রেমে এবং ভক্তিতে এই সমর্পণ আবশ্যক।। ইহা না হইলে জীবনের নৈবেদ্য সম্পূর্ণ হয় না।

আজিও ভারতবর্ষ এই সমর্পণে বিশ্বাস করে। আজিও ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িবার মানে বন্ধ দ্বারে রঙের কড়া নাড়া। ভুলিয়া যাওয়া কোনো কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়া। বসন্তের দখিনা বাতাস অনেক কিছু কহিয়া যায়। অনেক কথা উহ্যও রাখিয়া দেয়। দোলের রং মাখিয়া মাখাইয়া মানুষ যে শুধু আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায় তাহা নহে, উহ্য কথাটির বিষাদও তাহাকে স্পর্শ করিয়া যায়। কারণ প্রেম বিরহ ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন। ভারতবর্ষ তাহা জানে। জানে বলিয়াই প্রেমের মতো বিরহকেও সে রাঙাইয়া তুলিতে পারে। দুঃখ পাইতে হইবে বলিয়া সত্যকে স্বীকার করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই।

সুভাষিতম্

সত্যেন ধার্যতে পৃথ্বী সত্যেন তপতে রবিঃ।

সত্যেন বায়বো বান্তি সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।।

সত্যের জন্যই পৃথিবী টিকে আছে। সত্যের জন্যই সূর্য তাপ প্রদান করে। সত্যের জন্যই বায়ু প্রবাহিত হয়। সবকিছুই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

কেবল 'যোগীর জয়' বাঁচাতে পারে রাজ্য বিজেপিকে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এ লেখা যখন ছাপা হবে তার মধ্যে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে সাফল্য পেয়ে যাবে। অর্থাৎ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত রাজ্য বিজেপির অগ্নি পরীক্ষার শুরু। পঞ্জাব ছাড়া অন্য ৪ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির মন্দের ভালো ফলের ফয়দা কতটা নিতে পারে রাজ্য বিজেপি সেটাই দেখার।

বাঙ্গলার গ্রাম ঘরে একটা ছড়া শোনা যায়— 'চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংড়া কাঠিতে'। ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া বাম দলগুলি রাজ্যে আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ১০৮ পুরসভা ও অন্যান্য পুরভোটে বিজেপিকে তারা পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। ঘরে বাইরে বিজেপির ছন্নছাড়া অবস্থা। এক প্রকার অস্তিত্বসংকট। কোঁদল আর আত্মশুদ্ধির দড়ি টানাটানির খেলায় নাজেহাল তারা। গোদের উপর বিষফোঁড়া কিছু নেতা যারা নির্বাচন লড়েননি বা হেরে গিয়েছেন তাদের ঘিরে দলে কার্যত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বলা হচ্ছে এরা কোটায় জায়গা পেয়েছেন। যোগ্যতায় নয়। সন্ত্রাসের কুমিরছানা দেখিয়ে পরাজয়ের ব্যাখ্যা দিতে চাইছে কিছু বিজেপি নেতা। অনেকে তা মানতে নারাজ। ৯ মাস আগে নদীয়ার ১৭টি বিধানসভায় বিজেপি ৯টি আসন পায়। পৌরভোটে ভরাডুবি হয়। সিপিএম তাহেরপুর জিতে নেয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর বীরভূমের ৩২ বিধানসভায় বিজেপি পেয়েছিল ১৪ আসন।

প্রশ্ন উঠেছে, এসব জেলায় কোনো সন্ত্রাস হয়নি অথচ বিজেপি শূন্য হলো কি করে? বিধানসভার নিরিখে ১০৮টি পুরসভার মধ্যে ৬৪টি-তে এগিয়ে ছিল বিজেপি। এখন শূন্য হয়ে গিয়েছে। সিপিএম ১৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে আর বিজেপি ১২। ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে গ্রীষ্মেও শীতঘুম দিচ্ছে তৃণমূল। দায়িত্ব এড়াতে বিজেপি আওয়াজ তুলেছে 'তৃণমূল দিচ্ছে ডাক, সিপিএম বেঁচে থাক'। যুক্তিটি হাস্যকর আর অবাস্তব। ৯ মাস আগের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নতুন করে ৫৪ আসন পায়। সিপিএমের থেকে ২৫ আর কংগ্রেসের থেকে ২৯ আসন তারা ছিনিয়ে নেয়। ৯ মাস পর সেই তৃণমূল বিজেপিকে আটকাতে সিপিএম-কে ভোট দিচ্ছে? এটা অবান্তর।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর কমতে কমতে ৪ শতাংশে নেমে যায় বামেরা। রাজ্যের মানুষ আবার নাকি তাদের উপর আস্থা ফিরে পাচ্ছে। তেমনটাই দাবি করছে বশংবদ কয়েকজন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী। সত্য মিথ্যা বিচার হবে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। ততক্ষণ দ্বিতীয় বিরোধী মুখ হিসাবে উঠে আসার লড়াই চালাতে হবে রাজ্য বিজেপিকে। আমার ধারণা উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে বিজেপি বড়ো ভাবে ফিরতে না পারলে রাজ্য বিজেপিতে অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। তাই রাজ্য বিজেপি তাকিয়ে আছে আদিত্যনাথ যোগীর সাফল্যের উপর যা হয়তো আসবে।

মমতার একদা প্রধান উপদেষ্টা প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছিলেন বিজেপি এখানে থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয়। তিনি রাজ্য বিজেপির ভস্মাসুর রূপ আন্দাজ করতে পারেননি। এখন সিপিএম-এর অগতির গতি কিছু পক্ককেশ বৃদ্ধ নেতা। কংগ্রেসের গান্ধী পরিবার। তেমন রাজ্য বিজেপির কয়েকজন দিল্লি নেতা। শোনা যাচ্ছে এপ্রিলে কেরলের কুন্নুরের ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে সিপিএম খোলনলচে পালটাবে।

রাজ্য থেকে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতিতে যাঁরা রয়েছেন রাজ্যের কোনো কর্মসূচিতেই তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ৭ জনের মধ্যে ৫ জন হেরে গিয়েছেন। একজন ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে পালিয়েছিলেন। এখন গা ঢাকা দিয়েছেন। ক্বচিৎ তাঁকে বাঙ্গলায় দেখা যায়। দলীয় বুদ্ধিজীবী বলে তিনি নিজেই বড়াই করে বেড়ান। বাকি ৬ জনের মধ্যে ১ জন এমুখো হন না। অন্যরা কোনো কর্মসূচিতে থাকেন না। বিজেপি কিন্তু জাতীয় দল। তাই প্রশ্ন উঠছে তারা কি জাতীয় নেতা? প্রচলিত ছিল 'বাম ভোট রামে' গিয়েছিল। তাই রাম ১২ থেকে ৪২ শতাংশ ভোটে উঠেছিল। ২০২১-এর ভোটে তা ৩৮-এ নেমে যায়। সে ভোট নাকি আবার বামে ফিরছে। প্রকাশ্যে না বললেও বিজেপি অশনি সংকেত দেখছে। মমতার শীতঘুম ভাঙলে কি হবে সেটাই দেখার। আপাতত লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশ। এদিকে ভেঙে পড়া গেরুয়া শিবিরের পতাকা উলটে জমি খুড়ছে বামেরা। তাই রাজ্য বিজেপিতে আওয়াজ উঠেছে 'সাধু সাবধান'। □

থ্যাঙ্ক ইউ মোদীজী

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
নয়া দিল্লি

মোদীজী,

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভারতীয় হিসেবে তো বটেই, বাঙ্গালি হিসেবেও। আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে নিয়মিত কটাক্ষ করে থাকেন, অনেক সময়ে খারাপ ভাষাতেও আক্রমণ করে থাকেন। এর জন্য আমি বাঙ্গলার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। জানি, আপনি এ সবকে মোটেও গুরুত্ব দেন না। বরং, কর্তব্য পালনে আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দিদিকেই আমি বেশি চিঠি লিখি। আমার ভালো লাগে। আপনাকে সেভাবে সম্বোধনই করা হয় না। কিন্তু এবার করতে হলো। কারণ, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পরে পরে আপনি যে ভূমিকা নিয়েছেন তার প্রশংসা না করে পারা যাবে না। সত্যিই অনেক ভারতীয় পরিবার আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এমন পরিবার এই বাঙ্গলাতেও রয়েছে কয়েকশো। সেই সব পরিবারের ছোটো, বড়ো সদস্যরা মানছেন, আপনি ছিলেন বলেই এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। ইউক্রেনে পড়তে যাওয়া বাঙ্গলার পড়ুয়ারা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছেন।

লকডাউনের সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে ভাবে রাজ্যে রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা আপনার সরকার করেছিল তার জন্যও দেশ কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে বারেও আপনার সমালোচনার শেষ ছিল না। আমাদের দিদি থেকে আরও অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ঠিক নয়, বলে দাবি তুলেছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেরা কী কী করেছিলেন তা সকলের জানা। এইবার যখন জানা গেল, রাশিয়ার হাতে আক্রান্ত ইউক্রেনে অনেক ভারতীয় রয়েছেন, তার মধ্যে সাড়ে তিনশোর মতো বাঙ্গালিও রয়েছেন তখন দিদি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে এঁদের বাড়ি পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁর রাজ্য সরকার করে দেবে। ভাবটা এমন ছিল যে, হাওয়াই চটি পরেই তিনি পূর্ব ইউরোপের ইউক্রেনে চলে যাবেন। সেখান থেকে রাশিয়াকে বাবা বাছা বলে বুঝিয়ে, যুদ্ধ থামিয়ে বাঙ্গালি পড়ুয়াদের নিয়ে আসবেন।

কিন্তু বাস্তবটা কী ছিল ওখানে থাকা পড়ুয়ারা জানেন। তাঁরা রোমানিয়া, পোল্যান্ড বা হাঙ্গেরিতে চলে এসে যে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁর জন্যও যে কৃতিত্বের দাবি রাখতে পারে আমাদের দেশের পররাষ্ট্র নীতি, সেটা সকলেই বুঝছেন। আপনি বিদেশে গেলেই যাঁদের গাত্রদাহ হয় তাঁদের কিন্তু এবার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার দিন। সত্যি সত্যিই তাঁরা বুঝলেন, আপনি বেড়াতে যান না। আপনি বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক তৈরি করতে যান। আমি গণমাধ্যমের ছাত্র। তাতে এটা পড়ানো হয় যে, সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনও সংস্থা যখন বিপদে পড়ে তখনই বোঝা যায় তাদের জনসংযোগ বিভাগ কেমন কাজ করে। এবার ভারতীয়রা যখন ইউক্রেনে বিপদে পড়ল তখন বোঝা গেল ভারতের বিদেশ-সংযোগ কতটা পোক্ত। ভারতীয়দের ফেরানো জন্য যে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ছে তার সঙ্গে যেমন বোঝাপড়ার দরকার ছিল, তেমনই আক্রান্ত ইউক্রেনের সঙ্গেও সুসম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। আবার ভারতীয় বায়ুসেনা যেসব দেশ থেকে পড়ুয়াদের দেশের মাটিতে আনার জন্য বিমান পাঠিয়েছে তাদের সঙ্গেও সুসম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। সেটা যে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইউক্রেন সীমান্ত পার করার পরে কোথাওই ভারতীয় পড়ুয়ারা অনাহূত অতিথির মতো অবহেলা সহ্য করেননি। ইউক্রেন সীমান্ত পার করার আগে যেটুকু হয়েছে সেটা হওয়ারই ছিল।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশে কিছু সমস্যার মুখোমুখি তো হতেই হয়। কিন্তু সব শেষে ওঁরা নিজেরা তো বটেই যাঁদের পোষ্য ছিল তাঁরা সেই প্রিয় কুকুর, বিড়ালদের নিয়েও নিজের ঘরে ফিরতে পেরেছে।

মোদীজী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ধন্যবাদ শুধু আমার পক্ষ থেকে নয়, বীরভূমের সিউরি শহর থেকে ইউক্রেন পাড়ি দেওয়া শাহরুখ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের ছাত্রী শ্রীমার পক্ষ থেকেও। ওঁদের বাবা, মায়ের পক্ষ থেকেও। ওঁদের আত্মীয়, পরিজন, প্রতিবেশীদের থেকেও। কারণ, একটি

ছেলে বা মেয়ে চিকিৎসক হবে এমন স্বপ্ন কেউ একা দেখে না। অনেকে মিলে দেখে। যে স্বপ্ন রুশ ক্ষেপণাস্ত্রও গুড়িয়ে দিতে পারেনি। তাই ওঁরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের যেতে চায় ইউক্রেনে। সেখানে ওঁদের না শেষ হওয়া ডাক্তারি ডিগ্রি আর রাশি রাশি স্বপ্ন রয়ে গিয়েছে। আমি জানি, ওঁরা যাতে আবার যেতে পারে ওঁদের লেখাপড়ার দেশে সে উদ্যোগ আপনিই নেবেন। আপনার হাত ধরেই ওঁদের স্বপ্ন পূরণ হবে।

আপনাকে আগাম অভিনন্দন। অপারেশন গঙ্গা বিজয়ী হোক। □

অতিথি কলম

সীমানার বাইরের ডাক্তারি শিক্ষানবিশদের সংকটকাল

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

রাশিয়ার সীমান্ত দেশ ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য ইউক্রেনের সঙ্গে বেঁধে যাওয়া সংঘর্ষ এখন সীমান্ত ছাড়িয়ে দেশের রাজধানী কিয়েভ শহর-সহ অন্যান্য বড়ো শহরগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের শহরগুলিতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু মেডিক্যাল কলেজও রয়েছে। এই যুদ্ধের বহু আন্তর্জাতিক সমীকরণ আছে। আমেরিকা ও তার সঙ্গী ন্যাটো সদস্য দেশগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নজরে আসছে। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ (শব্দার্থে না হলেও) হলে উলুখাগড়ার প্রাণ যাওয়ার মতো ভারতের হাজার হাজার ছাত্রের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উল্লেখিত চিকিৎসা প্রশিক্ষণের কলেজগুলিতে পড়ুয়া ভারতীয় ছাত্ররা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা তাদের সব কিছুই আজ বিপন্ন। গভীর চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন ভারতে স্থিত তাদের আতঙ্কিত অভিভাবকরা। অবশ্যই ভারত সরকার সর্বতোভাবে যতদ্রুত সম্ভব তাদের স্বদেশে ফেরাবার প্রচেষ্টা নিয়েছে। কিন্তু দেশ থেকে দেশান্তরে ব্যাপক সংখ্যায় প্রত্যাবর্তনের আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে এ কাজে কিছুটা সময় তো লাগবেই। যথাসম্ভব দ্রুততায় সম্পন্ন করতে চার-চারজন মন্ত্রী ইউক্রেনের সীমান্তে অবস্থিত পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে পৌঁছে তদারকি করছেন। ১৫ হাজার ছাত্র এই লেখা প্রেসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত দেশে ফিরেছে।

কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে, আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষণের চলতি সিস্টেম নিয়ে। বলতে দ্বিধা নেই, চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা বাস্তবে ভারতে এখনও মুষ্টিমেয় সুবিধেজনক অবস্থায় থাকা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউক্রেনে আটকে পড়া পড়ুয়াদের কষ্টের মর্মন্তুদ সংবাদগুলি আমাদের যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের বিয়োগান্তক ঘটনা এই প্রথম নয় আর ভবিষ্যতেও যে ঘটবে না এমন নিশ্চয়তাও আজকের তারিখে দেওয়া যায় না। প্রথম যখন ‘করোনা ১৯’-এর আক্রমণ চীনের উহান প্রদেশে শুরু হলো এবং দ্রুত মহামারীর আকার ধারণ করল তখন সেখানে আটকে পড়েছিল কয়েক হাজার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা অকূলপাথারে পড়ে যায়। আজকে সরকার তো এ বিষয়ে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু রপ্ত করে নিয়েছে। ইউক্রেনে চীনের মতোই ২২ হাজার আটকে পড়া ছাত্রদের গরিষ্ঠাংশই সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া। এমন অবস্থায় মূল চিকিৎসা শিক্ষায় যে গলদ বাসা বেঁধে রয়েছে তার দুরীকরণ একমাত্র রাস্তা। ভাবতে হবে ভবিষ্যতে ভারতে ফিরে তারা স্বাস্থ্যগত ও অভ্যাসগত ভাবে যে ভারতীয় রোগীদের সেবা করবে তাদের প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া দেশের মানুষজনের সঙ্গে এইসব দেশীয় লোকেদের শরীরগতভাবে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। তবুও তারা কেন অর্থ ব্যয় করে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে?

এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, চিরাচরিতভাবে অ্যালোপাথিক বা পাশ্চাত্য ধারায় তৈরি ওষুধের ওপর নির্ভর করার উত্তরাধিকার। দ্বিতীয়ত, যুগ যুগ ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণে খামতি। তৃতীয়ত, চিকিৎসা শিক্ষাকে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কাছে অধরা রাখা। কেবলমাত্র ধনী ও উন্নত সামাজিক শ্রেণীতে অবস্থানকারীদের করায়ত্ত রাখা।

ভারত ১৩৫ কোটি জনসংখ্যার দেশ হলেও এখানে সর্বমোট মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৫৫০টি। এই কলেজগুলি থেকে বছরে সাকুল্যে ৬০ থেকে ৭০ হাজার চিকিৎসক পাশ করে বেরোয়। এর মধ্যে বহু কলেজের শিক্ষাগত পরিকাঠামোর মান যথাযথ নয়। উন্নততর এমডি বা এমএস শিক্ষার পঠনপাঠন দিতে সক্ষম কলেজের সংখ্যা আরও কম। আসন সংখ্যা ৬ হাজার মাত্র। এছাড়া দেশের Diplomate of National Board (DNB)-এর মাধ্যমে আরও ১৬ হাজার আসন আছে। এগুলি এমডিআইএমএস-এর সমতুল নয়।

প্রতি ১ কোটি লোকসংখ্যা পিছু মোটামুটি ৫টির কাছাকাছি মেডিক্যাল কলেজ আছে। এগুলিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাই প্রতিযোগিতা তীব্র। সরকারি কলেজগুলিতে অনুপাত ১টি-তে ৫ জন। আর বেসরকারি কলেজগুলিতে Capitation fee আকাশ ছোঁয়া। শুধুমাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে নয় সারা বছরের থাকা-খাওয়া, হস্টেল চার্জ মধ্যবিত্ত ও গরিবের নাগালের বাইরে। এগুলি কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আবার পাশ করে বেরোবার পর নব্য চিকিৎসকরা বেসরকারি বড়ো বড়ো করপোরেট হাসপাতালগুলিতে মূলত যেগুলি বড়ো বড়ো শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সেখানে নিযুক্ত হতে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। অথচ সেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সীমিত। এরই বিপরীতে পাশচাত্য দেশগুলিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা, শিক্ষার পর উপযুক্ত চাকরিতে নিযুক্তি এবং কাজ করার পরিবেশ তুলনামূলক ভাবে উন্নত হওয়ায় যুক্তিযুক্ত আকর্ষণে আমার মতো অনেকেই সেখানে পাড়ি দেয়। এর ফলে বহু মেধাবী ও নিষ্ঠাবান ভারতীয় চিকিৎসক, পরিবার, সন্তান সন্ততিও উন্নত পরিবেশে কাজ করার আকর্ষণে বিদেশে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এর ফলে দেশে ডাক্তারের অনটন আরও বাড়ে। ভারতের বিশাল গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসার হাল চিন্তাজনক। সেখানে রোগী পিছু ডাক্তারের অনুপাত বলার মতো নয়। ২০১৭ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি এক হাজার জন প্রতি ১.৩৪ জন ডাক্তার পাওয়া যায়। এই ডাক্তারদের মধ্যে অ্যালোপ্যাথিক শিক্ষিতের সঙ্গে আয়ুষ প্রথায় শিক্ষিত ডাক্তারাও রয়েছেন।

শহর অঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ডাক্তার অনুপাতের ক্ষেত্রে যথারীতি শহর সুবিধেজনক অবস্থায় থাকে। চিকিৎসার পরিকাঠামো, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নেও শহরের ব্যবস্থাপনা অবশ্যই গ্রামের থেকে উন্নত।

আরও চিন্তার কথা, আমার নিজের চালানো একটি সমীক্ষায় দেখেছি রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপ্রশিক্ষিত চিকিৎসা প্রদানকারীদের সঙ্গে শিক্ষিত চিকিৎসকের সার্বিক পারদর্শিতায় বিরাট পার্থক্য নেই। সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিধান ও ওষুধ প্রদানের ক্ষেত্রেই আমারা সমীক্ষা চালিয়েছিলাম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যব্যবস্থায় উন্নয়নের নিদান হিসেবে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষিত পেশাগত চিকিৎসকের দ্বারাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনার প্রেসক্রিপশান দিয়েছে।

এই সূত্রে চিকিৎসাবিদ্যার পেশাটি বর্তমানে ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। প্রথমত, মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তায় উপযুক্ত পরিবর্তন আনা, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপযুক্ত specialisation পাওয়া এবং দেশেরই মধ্যে স্থানবিশেষে শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে সজাগ থেকে নিজের পেশার অগ্রগতি। বেশিরভাগ দেশের সরকারই এগুলির গুরুত্ব স্বীকার করে। যেহেতু চিকিৎসকদের পেশায় সর্বক্ষণের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয় তাই সরকারি স্তর থেকে প্রচুর ভরতুকি প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট ট্রেনিঙের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনানুগ চিকিৎসক নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি সারা বিশ্বের চিকিৎসা ক্ষেত্রের কথা।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিশ্বের চিকিৎসাক্ষেত্রে বাজারের নিয়ন্ত্রণ প্রবল। পেশাগত চিকিৎসায় specialisation-এর ক্ষেত্রে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেকজগুলি ভূমিকা নেয়। ইউরোপের বহু দেশ, যেমন--- কানাডা, অস্ট্রেলিয়া শিক্ষায় ভরতুকি দিলেও সেখানকার বেসরকারি কলেজগুলি দেশীয় ছাত্রদের থেকে যে টাকা নেয়, বিদেশি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের অভিবাসন নীতিতেও এমন কড়াকড়ি করে, যার ফলে অনেকের পক্ষেই ভর্তি হওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। এটা বিদেশিদের নিরস্ত করার সফল রাস্তা হিসেবে তারা প্রয়োগ করছে।

এবার ইউক্রেনে এত ভারতীয় পড়ুয়ার ভিড়ের তাৎপর্যটা লক্ষণীয়। পূর্বতন সোভিয়েতের অন্তর্গত দেশগুলি এখনও বিপুল ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এর ফলে লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার সামগ্রিক খরচা তুলনামূলকভাবে অনেক কম পড়ে। ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা অনেক শিথিল। এই কারণগুলিই ভারতীয় ছাত্রদের চীন ও রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তাদেরই পূর্বতন সোভিয়েতের আওতায় থাকা ইউক্রেনের প্রতি টেনে নিয়ে গেছে। শিক্ষার গুণগত মান সে অন্য প্রসঙ্গ। ভারতে এসে যোগ্যতা প্রমাণের পরীক্ষার সাফল্যের পরিসংখ্যান আরও স্বতন্ত্র বিষয়।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে তার মধ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রের সাধারণ কর্মীদের আবার লড়াই রয়েছে। যার ফলে বহুক্ষেত্রেই হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো এবং উন্নত পরিষেবা দানের উপযুক্ত পরিবেশ থাকে না। সরকারি তরফে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভরতুকি ও বিনিয়োগ করার পরও মেধাবী পেশাদার চিকিৎসকরা কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখে না, তারা গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় যোগ দিতে চায় না। একই সঙ্গে চিকিৎসক-শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছেও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এটি বিশ্বের বহু দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ বাড়তি কোনো সুবিধা না দিলে তারা গ্রামীণ বা ছোটো শহরে প্র্যাক্টিস করতে অনীহা প্রকাশ করছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পরিকাঠামোগত ত্রুটি এমন একটি মহান পেশা ভারতীয় উপমাহাদেশ ও আফ্রিকার মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ পছন্দের তালিকায় রাখছে।

এই বিষয়টি সরকারকে মনযোগ দিয়ে বিচার করতে হবে যাতে তরুণ সম্প্রদায় দেশের মধ্যেই থাকতে আকৃষ্ট হয়। তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে বিনিয়োগ, নতুন পথনির্দেশ সন্ধান করে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করতেই হবে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক)

ভ্রম সংশোধন

গত ৭ মার্চ সংখ্যায় মাসিক রাশিফলে ফেব্রুয়ারি (২০২২)-র স্থলে মার্চ (২০২২) পড়তে হবে।

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

— স্বঃ সঃ

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,

২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।

৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।

৫. সম্পাদকের নাম : তিলক রঞ্জন বেরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।

মালিকানা : ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :

শ্রী মোহনলাল পারীখ, পারীখ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, বি কে মার্কেট, ১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১।

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৪।

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

তারিখ ঃ ১৪.০৩.২০২২

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ভারতের কূটনীতি

চীনপন্থী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কিছু সংবাদ-গোষ্ঠী এবং কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল অহেতুক খুঁত ধরে দূতাবাসের ও বিদেশমন্ত্রকের কর্মীদের মনোবল ভাঙতে সচেষ্ট, যা দেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের দীর্ঘদিন কোনো সুস্পষ্ট বিদেশনীতি ছিল না। তাৎক্ষণিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিদেশনীতি গৃহীত হয়েছিল। সেইসূত্রে রাশিয়া ভারতের মিত্রদেশ। কারণ ১৯৪৭-এর পর ভারত যতবারই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে, ততবারই রাশিয়া ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে আমেরিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। পাকিস্তানি উগ্রপন্থাকে সৃজন করার ক্ষেত্রে মার্কিন মদতের কথা কারোরই অজানা নয়। ভারতে জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সরকারের বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম 'বিদেশনীতি' প্রণয়নে সচেষ্ট হন। তিনি রাশিয়া অভিমুখী আমাদের বিদেশনীতির কিছুটা পরিবর্তন সাধন করলেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র রাশিয়া অভিমুখীনতাতেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না দেশের বিদেশনীতি। রাশিয়ার পাশাপাশি ভারতের বিদেশনীতিতে আমেরিকাও তখন থেকেই সমগুরুত্বের অংশীদার হলো। ফলে এতদিনকার ভারতের একমুখী বিদেশনীতি বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর সুবাদে '৭৭ থেকে দ্বিমুখী নীতিতে পরিণত হয়েছিল। সামরিক শক্তিতে দুই মহাশক্তিধরের সঙ্গেই কূটনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল ভারত।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাজপেয়ীর জমানায় ভারত শুধু সুস্পষ্ট বিদেশনীতি প্রণয়নেই সফল হয়নি, আধুনিক বিদেশনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সমরশক্তিতেও ভারত বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যায়, ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষণের সফলতার মাধ্যমে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নীতিকেই আঁকড়ে ধরে তার পরবর্তী সময়ে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আমাদের বিদেশনীতিকে আরও সুসংহত করেছে। পুরোনো কাসুন্দি কিছুটা ঘাঁটতে হলো কারণ রাশিয়া- ইউক্রেনের সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান। রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ সুসম্পর্কের কথা মাথায় রেখে এখনই রুশ-বিরোধী কোনোরকম পদক্ষেপের কথা মাথায় আনছে না ভারত।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক কূটনীতিও জড়িয়ে আছে। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়া। সামরিক শক্তিতেও ভারত রাশিয়ার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল। ভারতে অস্ত্র আমদানির প্রায় ৬৫-৭০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সখ্য এখন দুর্দান্ত। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় রাশিয়া-বিরোধী কোনো পদক্ষেপের অর্থ তাদের চীনের আরও নিকটবর্তী করা, যা ভারতের জন্যে মোটেও ভালো হতো না। এইসব কূটনৈতিক-সামরিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে রাশিয়া ইউক্রেন সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাশিয়া বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ভারতের বিদেশনীতি এখন এতটাই সুস্পষ্ট যে এনিয়ে কালি খরচ করার কোনো দরকার পড়ে না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এখন এমনই পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে যে ভারতের স্বার্থ নিয়েও দেশে রাজনীতি চলছে পুরোদমে।

একথা ঠিক, ইউক্রেনে ভারতীয় পড়ুয়ারা যারা যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন তাদের পরিবার নিরতিশয় উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাদের এই উদ্বেগ যে খুব স্বাভাবিক, এটা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু এও সত্যি, যারা আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়েন, যতক্ষণ না সেখান থেকে উদ্ধার পান, সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে থাকার যন্ত্রণাটা তাঁরাই বোঝেন। কিন্তু তাঁদের সেই ব্যক্তিগত যন্ত্রণার অভিব্যক্তিটুকু নিয়ে ভারতের রাজনীতির জল ঘুলিয়ে সেই ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টাটা নিশ্চয় অন্যায়। 'দেরিতে কেন উদ্ধার শুরু হলো', 'উদ্ধার কেন ঠিকমতো হচ্ছে না', এরকম নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ বিরোধী দল, এমনকী কোনো সংবাদ-গোষ্ঠীর তরফ থেকেও করা হচ্ছে। 'ভিত্তিহীন অভিযোগ' বললাম কারণ, এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হলে বিচারপতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমি তো আর যুদ্ধ থামানোর নির্দেশ দিতে পারি না'।

এই বাস্তবতার জায়গাটাই হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন। রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস ও কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা বন্দি তাঁদের মানসিক অবস্থা বিচার্য বলে না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংবাদমাধ্যমের উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু চীনপন্থী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কিছু সংবাদ-গোষ্ঠী এবং কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল অহেতুক খুঁত ধরে দূতাবাসের ও বিদেশমন্ত্রকের কর্মীদের মনোবল ভাঙতে সচেষ্ট, যা দেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়। অবিলম্বে এই অপচেষ্টা বন্ধ হওয়া দরকার, দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে। □

পকসোতে অভিযুক্ত আনিসের মৃত্যুতে মুসলিম কোল পেতে চাইছে সবাই

এই মৃত্যু যদি আনিসের না হয়ে অসীমের হতো তবে তথাকথিত প্রগতিশীলরা কি পথে নামতেন? আনিসের মৃত্যুর পর তার স্বধর্মের মানুষেরা যা বলছে পুলিশ তাই করছে— অসীমের ক্ষেত্রে তাই হতো কী? প্রশ্নটা কিন্তু আসবেই।

সুকল্প চৌধুরী

গোটা বিশ্ব এখন রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। ফলে আমাদের দেশেও পেট্রোপণ্যের মূল্য আরও অনেকটাই বৃদ্ধি হতে পারে। এর অভিঘাত এসে পড়বে বাজারে।

দিল্লি থেকে আকাশ পথে প্রায় ছয় ঘণ্টার দূরত্বের দেশ ইউক্রেনে এই যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া সমস্যা নিয়ে গোটা দেশ চিন্তিত। সেই সময় এই রাজ্যের কিছু সংবাদমাধ্যম অর্থহীন পুরভোট আর আনিস খানের 'হত্যাকাণ্ড' নিয়ে ব্যবসা করে চলেছে। সকলেই জানেন, বিগত রাজ্য বিধানসভা ভোটের মতো অস্ত্রধারী রোহিঙ্গা আর অনুপ্রবেশকারী এবং কট্টরপন্থীদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশকে পকেটে পুরে পুরসভার ভোট হয়েছে। তবে এবার সঙ্গে পেয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। প্রসঙ্গত বলা যায় এই ভোট-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহামান্য আদালতের কয়েকজন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফেবারিট, হাওড়ার আমতার বাসিন্দা আনিস খানের 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য আলোড়িত হয়েছে। অনেকেই এই মৃত্যুকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে ভাবছেন। তবে প্রায় সবার ধারণা এই মৃত্যুর পেছনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আছে। আনিসের মৃত্যুর পর মুসলমান ভোট অক্ষুণ্ণ রাখতে, মুসলমানদের কাছে দলের ও নিজের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং ঘটনা ধামাচাপা দিতে সক্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর সদস্যদের প্রাথমিক ধারণা হাওড়ার কোনও প্রতিপত্তিশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নির্দেশে এই ঘটনা ঘটেছে। এই নেতার প্রভাব কলকাতাতেও বিস্তর। এখন প্রায় সব পুলিশ তো বটেই সিভিক ও হোমগার্ড সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। ফলে এই খুনে পুলিশ বা আধা পুলিশ যুক্ত থাকতেই পারে। সকলেই জানেন ঘটনা নিয়ে আলোড়ন শুরু হতেই আমতা থানার হোমগার্ড কাশীনাথ বেরা ও সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রীতম ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই গ্রেপ্তার যে মুসলমানদের খুশি করতে ও আসল ঘটনা থেকে দৃষ্টি সরাতে সে কথা বুঝতে তৃণমূলি হতে হয় না। কিন্তু এটা নিশ্চিত এই ঘটনার পেছনে আসল মাথা কে এই সরকারের আমলে কোনও দিনই জানা যাবে না।

এবার একটু অন্য ভাবে দেখা যাক। অতি 'গরম' বাম, সাধারণ 'নরম' বাম এবং কিছু সংবাদমাধ্যমের কাছে হঠাৎ করে প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতা বনে যাওয়া আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আনিস খান নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। ইউক্রেনে আক্রমণকারী রাশিয়ার সমর্থক সিপিএম-সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি প্রথম থেকেই মুসলমানদের আপনজন ভাবে। সেই ভাবনায় থাবা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জমি ফিরে পেতে আপনজনদের পাশে দাঁড়িয়েছে বামেরা। কিন্তু প্রশ্ন আনিস কি কখনও বামেদের বিশ্বাস করেছে? কারণ, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে আনিস প্রথম থেকেই কট্টর মুসলমান সংগঠনগুলির সমর্থক। মুসলমানরা সব সময়ই সুবিধাভোগী হলেও ব্যতিক্রমী হিসেবে আনিস বামেদের থেকে দূরেই থেকেছে। মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করা আলিয়ার ছাত্র সিএএ বিরোধিতার নামে জমায়েত করে দেশ বিরোধী বক্তব্য রেখে এবং প্রচার চালিয়ে মুসলমান নেতাদের চোখে পড়ে। পুলিশের খাতায় লেখা আছে দেশ ও হিন্দু বিরোধিতা প্রচারের কাজে ব্যয় করার জন্য দিল্লি ও হায়দরাবাদ থেকে তার কাছে টাকা, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, বই,

ফ: ২

লিফলেট আসত। সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ভারত বিরোধী, হিন্দু বিরোধী আনিসের লেখা দেখা গিয়েছে। এহেন 'প্রতিবাদী' আনিসের বিরুদ্ধে কিন্তু গত পাঁচ বছর থেকে পকসো আইনে মামলা চলেছে। কট্টর মুসলমান ছাত্রনেতা হিসেবে আলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম ছড়িয়ে ছিল। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় জলসাগুলির প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ফুরফুরা শরিফের ঘনিষ্ঠ আনিস।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৫৭টি জলসা তার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ভেতর ২৬টি ছিল একক প্রচেষ্টায়। বিগত বছরে সে সব মিলিয়ে ৮৪টি জলসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে বিধানসভা ভোটের সময় আইএসএফ-এর হয়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। ফলে এই সময়টাতে জলসা সংগঠিত করতে পারেনি। এই জলসাগুলি অনুষ্ঠিত করার জন্য মুসলমান সংগঠনগুলির কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়মিত আসত তার কাছে। এর ভেতর মধ্যপ্রাচ্যের টাকাও আছে। জলসায় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে শুরু করে টাকা দেওয়া পর্যন্ত সে একাই করত। লেখাপড়ার নামে বেশিরভাগ সময় কলকাতায় কাটাত সে। ফলে ধর্মীয় কাজকর্ম, দেশ বিরোধিতা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগগুলি সহজ ছিল তার কাছে। তার চালচলন ও আয়েশি জীবন নিয়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। পার্কসার্কাস, তিলজলা, রডন স্ট্রিট, রাজাবাজার-সহ এই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান নেতা, এই দলের মুসলমান বিধায়ক, এই দলের মুসলিম কাউন্সিলারদের সঙ্গে তার সখ্য প্রকাশ্যেই দেখা গিয়েছে। তবে এই নেতাদের ভেতর মন্ত্রী ববি হাকিম ছিলেন না। এর পাশাপাশি ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের কট্টরপন্থী জেহাদি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তার। পুলিশের ধারণা বিভিন্ন নামে অন্তত তিনটি দামি মোবাইল সে ব্যবহার করত। যেগুলির এখনও হদিশ নেই।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে ঘটে যাওয়া হাওড়ায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করার অন্যতম মাথা ছিল আনিস। ঘটনার পর হুগলির এক প্রভাবশালী মুসলমান মৌলভির প্রভাবে আনিসের নাম পুলিশের গোপন তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। এই সময় কিছুদিন তার মাথায় হাত ছিল উলুবেড়িয়ার প্রাক্তন এক সাংসদের। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনের মামলা থাকলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি মুসলমান মোল্লা-মৌলভিদের প্রভাবে। সকলেই জানেন, প্রায় সব মুসলমান মোল্লা-মৌলভি তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত ও পোষিত। মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই আনিস কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের অন্যতম সদস্য ছিল। দুর্গা পূজার সময় বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের পর আনিসের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ আছে। বাম ও কংগ্রেসের সমর্থিত আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির অতীব ঘনিষ্ঠ ছিল আনিস। কর্ণাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিজাব বিতর্ক নিয়ে 'ইসলাম বিপন্ন' প্রতিপন্ন করে হিন্দু ও দেশবিরোধী পোস্ট করেছিল সে। পাকপন্থী মুসলমানদের মতো সে মনে করত কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের অংশ নয়।

এই বিষয়ে আনিস অবশ্যই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ফেবারিট। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসও মনে করে না জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অংশ। এই দলের মুখপত্র জাগো বাংলায় ছাপানো ভারতের ম্যাপে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ পাকিস্তানের অংশ বলে দেখানো হয়েছে। একটা বিষয় পরিস্কার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখতে সিট গঠন, দুই আপাত নির্দোষীকে গ্রেপ্তার, আমতা থানার ওসিকে ছুটিতে পাঠানো দলীয় নেতা, মুসলমান ব্যবসায়ী, পুলিশকে আনিসদের বাড়ি পাঠিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা, ভয় দেখানো সবই করেছেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তিনি প্রবলভাবে চেষ্টা করছেন আনিসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখতে, পরিস্থিতির অভিমুখ ঘোরাতে। আবার বামেরাও চাইছে পকসো আইনে অভিযুক্ত দেশ বিরোধী কট্টর সাম্প্রদায়িক এক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী নেতা হিসেবে তুলে ধরতে। বাঙ্গলার তথাকথিত বাম ঘেষা কিছু 'বুদ্ধিজীবী' অথবা নিজেদের নিরপেক্ষ ইমেজ বজায় রাখা কিছু পরিচিত মুখ আনিসের হয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় নেমেছেন।

পাশাপাশি মুসলমান মোল্লা-মৌলভিরা তো ইসলাম বিপন্ন বলে জোব্বার আড়ালে অস্ত্র নিয়ে হাঁকডাক করছেন। দেখা গিয়েছে এই রাজ্য তো বটেই দেশেও কিছু হিন্দু নাম ব্যবহার করা মানুষ নিজেদের অতি প্রগতিশীল ভাবতে ভালোবাসেন। তাঁদের প্রগতিশীলতা হলো দেশের বিরোধিতা করা, হিন্দুধর্ম বিরোধিতা, দেবদেবীর নগ্ন ও কদর্য রূপের ছবি দেখে ফাইন আর্ট বলে চিৎকার করা, মুসলমান সমর্থন, বিজেপি ও মোদী বিরোধিতা করা। তাই তাঁরা আনিস খানের ভেতর প্রগতিশীলতা দেখতে পান। দেশ বিরোধী, হিন্দু বিরোধী, সাম্প্রদায়িক আনিস খানকে দেখতে পান না। অনেকেই বলছেন, এই তথাকথিত অতি প্রগতিশীল ব্যক্তিরা কি কখনও ভেবেছেন, এই মৃত্যু যদি আনিসের না হয়ে অসীমের হতো তবে কি তাঁরা পথে নামতেন? আনিসের মৃত্যুর পর তার স্বধর্মের মানুষেরা যা বলছে পুলিশ তাই করছে— অসীমের ক্ষেত্রে তাই হতো কী? প্রশ্নটা আসবেই, কারণ অতি সাম্প্রতিক সময়ে এই বাঙ্গলায় ২৭৬ জনের মায়ের কোল খালি হয়েছে। ইনসাফ চাইতে এই প্রগতিশীলরা কেউ এক পা-ও হাঁটেনি। □

রবীন্দ্রগানে পূজার নৈবেদ্যে প্রেমের ফুল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

গান বাঁধা হলো পিলু-দাদরায় কিন্তু তার অভিসার উদ্ধত স্পর্ধিত। এই তো এক কথায় রবীন্দ্রনাথের গানে পূজা থেকে প্রেমের বা প্রেম থেকে পূজায় যাত্রা। কী কাকতালীয়, ১৯৩৯, ১৪ ফেব্রুয়ারির প্রেমের দিনেই নিজের গানের সুরের অভিসারের লীলায় রবিঠাকুর যখন অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিখানা লেখেন, তখন অবলীলায় উল্লেখ করেন— রাগরাগিনীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতার চেয়েও অনেক বড়ো সত্য গানখানা, তার বাণীময় ভাবরূপ, তার সুরের সমগ্রতা। কবি বলেন, 'মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা তা ব্যাখ্যার অতীত'। রবিঠাকুর সৃষ্টিরহস্যে এইখানেই গহন গভীর; কারণ তাঁর স্বরের বুকে কাঁপনধরা শব্দ অনুরণনের প্রেমপর্যায় এবং পূজাপর্যায়ের গান যেন সীমারেখায় বিলীন হয়েছে বারে বারে। নিবেদনে সমর্পণে রাগের নির্দেশে প্রেমের নিভৃত সুরটি ধরার কণ্ঠে অচেতনভাবে কখন যে পূজা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তা যেন দিশেহারা পাখির ভাষায় 'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম... আসিতে তোমার দ্বারে'—এমন আবেদনই করে। পূজা ও প্রেম পর্যায়ের গান জীবন দর্শনের অনন্ত যাত্রার পরিণতি। বহু গানে কে যে কবির মানসীপ্রিয়া তার তল পাওয়া অসাধ্য। মানসী থেকে জীবনদেবতা হয়ে ওঠা যেন শুধুমাত্র বোধের অপেক্ষা। ক্রমঊর্ধ্বায়নে কণ্ঠের এবং জীবনের যে ব্যাপ্তি তাতে ছন্দে বাঁধা হলো 'কেবলি আঁখি দিয়ে/আঁখির সুধা পিয়ে/হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব... 'আঁখি না তিরপিত ভেল... হিয়ে হিয়ে রাখলু/তব হিয় জুড়ন না গেল'— এই যে অতৃপ্তি, একি কেবল বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব এবং কবির জীবনদেবতা তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। পূজা পর্যায়ের বহু গানকে প্রেম পর্যায়ে ফেলাই যায়, কারণ সীমার সঙ্গে অসীমের প্রেম গাঁথতে চেয়েছেন কবি।

তাঁর গান 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর...'। প্রেম এবং পূজার সত্য সন্ধান ছাড়া একে আর কি কিছু বলা যায়? বৈষ্ণবপদাবলীতে যেমন অভিসারের সুর ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথের 'যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি/ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি'— এতে ঈশ্বর এবং প্রেমিকের কাতরতা মিলেমিশে একাকার। ঈশ্বরবিরহের

কাতরতাকে আকুলতাকে সাহিত্যমহিমায় যে গভীর উপলব্ধিবোধে উত্তীর্ণ করেছেন তা প্রাক-রবীন্দ্র সাহিত্যে কোথাও নেই। নারীপ্রেমে বারে বারে পূজা পর্যায়ের ছোঁয়া লেগেছে, কারণ তাতে বৈষ্ণবীয় চিরন্তন প্রেমের আলতো স্পর্শ।

বেশিরভাগ নারীপ্রেমের গানে ফুল, বাঁশি, মালা, কুঞ্জবন, তমাল, কদম্ব, যমুনা, সখী, সজনী, অভিসার ইত্যাদি অজস্রবার ব্যবহৃত যা পদাবলী সাহিত্যের প্রেম ও পূর্বরাগের হাওয়া খেলায় এবং দৈহিক প্রেমের মাত্রা অতিক্রম করে কৃষ্ণপ্রেমের পিপাসা জাগায়। তাই প্রেম এবং পূজা পর্যায়ের গান একে অন্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছে। 'এখনো তারে চোখে দেখিনি/শুধু বাঁশি শুনেছি/মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি'— একি পূজা নাকি প্রেম? রাধা যেমন কৃষ্ণের মিলনের জন্য অপেক্ষায়, রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবন দেবতার আশাপথ চেয়ে আকুল হয়ে লিখছেন, 'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি/তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি'। আবার মিলনের কালে কবি লিখছেন 'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ/ও মোর ভালোবাসার ধন'।

প্রেমাস্পদকে নিবেদনের মধ্যেই আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ। এবং তাই বোধহয় পূর্ণ প্রাপ্তি। যখন অন্তরে সত্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কবি গান বাঁধেন 'ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি/আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি/তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম শতবার'। প্রেম পর্যায়ের গানে বহু ক্ষেত্রেই আত্মনিবেদনের অক্লান্ত প্রয়াস তাকে আপনা থেকেই পূজায় পরিণত করেছে। যেমন 'হিয়া আমার পেতে রেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে/আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি'।

এখানে প্রেম পূজার রূপে অবতীর্ণ। আত্মনিবেদন কি কেবলই প্রেম নাকি পূজা নাকি দুইই? যদি এই গানটা দেখি 'মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার' এবং যদি এর অন্তরায় যাই, 'সে যে সাগরপানের বাণী, মোর পরানে দিয়েছে আনি/আহা তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত'। আসলে রবীন্দ্রনাথের বহু গানের মধ্যে একটা জেন্ডার ফ্লুইডিটি লক্ষ্য করা যায়। যদি গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের ৩৪নং গানটি দেখি, যেখানে কবি নিজেকে নারীসত্তায় বিকশিত করছেন। কবি লিখছেন, 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে/যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে/পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা'। আবার ৪৭০ নং গানে পরম দেবতাকে সম্বোধন করছেন জীবনবল্লভ বলে।

লক্ষ্য করি, প্রেম পর্যায়ের ৬৮ নং গান, কবি আবার দেবতাকে সম্বোধন করেছেন 'প্রিয়', 'প্রভু' এবং 'পরমপতি' বলে— 'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে/চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে/তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর/দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে/আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে/নিত্য প্রেমের ধানে আমার পরম পতি হে'। আরও আশ্চর্য করবে ৯৩নং গান, যেখানে কবির নারী সত্তা তার প্রিয়র কাছে বাঁধা পরতে চাইছে, 'সব বাঁধনে তোমার সঙ্গে বন্দি কর মোরে/ওহে আমি বাঁধন-কামী'। অর্থাৎ শব্দচয়নে কবির প্রেমরূপা স্বরূপিণী কখনও কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা, তখন যেন প্রেম এবং পূজা নিবিড়। আবার কখনও লিঙ্গ চেতনায় তা জোরালো, তখন পূজা থেকে প্রেমের দিকে যাত্রা। একজন শিল্পীর চেতনাতে আমরা তলিয়ে যেতে পারি আর সেই অতল সাগরে ডুব দিয়ে একটার পর একটা গান শুনতে শুনতে নানান চর্চা করাই যায় কিন্তু সমাধান কি সত্যিই পাবো?

সত্যিই কি কেউ বলতে পারব গীতবিতানের পূজা পর্যায়ে ৫৭৯, ৫৮০ এই দুটি গান কেন? 'ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী একা একা করি খেলা...' অথবা, শেষ পঙক্তি 'চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা'। এখানে কোন পথের কথা স্রষ্টা নির্দেশ করতে চেয়েছেন তা সত্যিই অধরা। প্রেমের একটি গান বিপরীত ভাবনা জাগায়, যেখানে প্রেম অভিসার নয়, বরং পূজার মতো পথ নির্দেশ করছে, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা/এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা/যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো/ অকূল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা'। একে কেমন করে কবি প্রেম পর্যায়ে রাখলেন? কবির বিচারে একি পূজার যোগ্য নয়? আবার পূজা পর্যায়ের ৬৮নং গানটিও অবাক করে 'আমারে যে জাগতে হবে/কী জানি সে আসবে কবে/যদি আমায় পড়ে তাহার মনে/বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'—এ কেমন করে কেবলমাত্র পূজা হতে পারে? এ তো প্রেম!

আমার মনে হয়, কবি প্রেমপূজায় নিজেই দিশেহারা। কবি সৃষ্টি জাদুতে মগ্ন, তাই এই সূক্ষ্ম সীমারেখা তাঁর চেতনায় ধরা পেতে চায়নি। কারণ এই দুই শব্দ অর্থাৎ প্রেম ও পূজা যতক্ষণ পৃথক ঘরে বাস করে ততক্ষণ তারা অতৃপ্ত। তাদের ভাবের সহবাসেই জীবনতরঙ্গে বান আসে। সৃষ্টিতে জোয়ার আসে। গীতবিতানের শুরুতেই তাই ভূমিকায় কবি মাথা পেতে নিয়েছেন তাঁর এই আনন্দচর্চার মগ্নতাকে 'বিহ্বলপ্রাতে সংগীত সৌরভে/দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে'। তাই পূজা পর্যায়ের দ্বিতীয় গানেই কবি লিখছেন, 'মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা'। কবিই তো পূজা পর্যায়ে (১৫নং গান) যখন বলছেন, 'বলাকা কোন গগনে উড়ে চলে' তখন মন কোনো খাঁচায় ধরা থাকে না। গানের তরী তখন সাগরে ভেসে যায়।

কারণ এ যে 'চরমের সুখ মরমের ব্যথা', তাই প্রেম এবং পূজাকে কোনও অর্থেই ভিন্ন রূপে দেখলে তৃপ্তি আসবে না। কবি বলেইছেন তুমিই তো আনন্দলোক। জুড়াও প্রাণ। তাই যা সীমানার মাঝে প্রেম, তাই অসীমের সীমায় পূজা। দেবতারে প্রিয় করি; প্রিয়েরে দেবতা। সেই মনোহরের খোঁজ করতে করতে কখন যে আমরাও পূজা পর্যায়ের থেকে প্রেম আহরণ করি এবং প্রেমের পূজারি হয়ে যাই তা আমরা নিজেরাই টের পাই না। সৃষ্টি করতে করতে কবি বলেই ফেললেন, 'আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে/বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে'— প্রাণের হাটে যতই বেচা-কেনা বাড়ে ততই আমরা বোধহয় ঋণী হই। ঋণী হই প্রাণের মানুষের কাছে, প্রাণদেবতার কাছে। যত জানি তাকে তত অজানা লাগে। তখনই চেতনায় ভক্তি জেগে ওঠে

এবং প্রেম পূজা মিলেমিশে এক ক্লাসিকাল পর্যায়ে উন্নীত হয়। সত্য জীবনের পাদপীঠে উপনীত করে আমাদের। সব লজ্জা মোচিত হয়ে তখনই অক্ষয় আন্তরসাধনা সজ্জিত হয়। ☐

একান্ত আপন

অনামিকা দে

কুমুদিদি তোমায় নীচের ঘরে ডাকছে, ওবাড়ির জ্যাঠাইমা এসেছেন, সঙ্গে রানিদি আর খুকুদিও এসেছে। তুমি যাবে না? কুমু চোখ খুলে একবার তাকিয়ে পাশ ফিরলো। না রে, শরীরটা ভালো লাগছে না, তুই বরং মিঠাইকে নিয়ে যা। আর শোন, ওর জামা বার করে রেখেছি চেয়ারের ওপর, পরিয়ে দে। চুলটা আঁচড়ে দিস। মিনতি মনে মনে বলল, কুমুদিদি আজকাল একেবারেই কারোর সঙ্গে কথা বলে না। বেশিরভাগ সময় ওপরের ঘরে থাকে নিজের মনে। মিঠাই— ও মিঠাইসোনা চলো আমরা নীচে যাই। মিঠাই খাটের ওপর খেলনাবাটি, পুতুল নিয়ে খেলছিল। মিনতির কথা শুনতেই পেল না মিঠাই। খুব মন দিয়ে ঘর ঘর খেলছে। মিনতি মিঠাইকে কোলে তুলে নিল। জামা পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে দিল সযত্নে। ঠিক যেমনটি করত কুমুর ছোটোবেলায়।

নয় নয় করে প্রায় পঁয়তিরিশ বছর ধরে মিনতি এই ভৌমিক বাড়িতে আশ্রিতা। এ বাড়ির গিন্নিমা রাধারানি দেবীকে ও নতুন বৌদি বলে ডাকে। নতুন বউ হয়ে যখন রাধারানি এবাড়িতে এল তখন মিনতি মাত্র ১৩ বছরের কিশোরী। এবাড়ির ঘড়ির কাঁটায় অনেক সময়ের ওঠানামা দেখেছে ও। ভালো-খারাপের আলো-আঁধারিতে এই ভৌমিক বাড়িকে কাছ থেকে দেখতে দেখতে এ বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছে মিনতি। বাড়িটা ছিল তখন একতলা, টালির চাল। পাশেই গোয়াল ঘর। বাড়ির সামনে গলির ওপারেই মস্ত বাগান। বাগানটা অবশ্য বাগান ছিল না, ছিল একটা ফাঁকা জমি। নতুন বউদির হাতের ছোঁয়ায় সে জমিতে ফুল-ফল, সবজি সবই হয়েছে। এখনও হয়। তবে এখন নতুন বউদির থেকে মিনতি কুমুদিদিকেই বেশি সাহায্য করে বাগানের কাজে।

ওবাড়ির জ্যাঠাইমা মানে রমলা দেবী তার দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছে সকাল সকাল। কই গো রাধারানি, আমাদের কুমুদিনী কই? আজ তো দোলপূর্ণিমা। আজকের দিনে তো অন্তত মেয়েটা একটু আনন্দ করুক। রমলা দেবী ছোটো থেকেই কুমুকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু ইদানীং তিনিও ঠেস দিয়ে কথা বলতে ছাড়েন না। আসলে ওর রেষারেষিটা রাধারানির সঙ্গে। তারই ঝলক দেখা যায় মাঝে মাঝে। এবাড়ির গৃহকর্তা সীতারাম ভৌমিকের বড়ো ভাই শ্রীধরের স্ত্রী রমলা। পাশের পাড়াতেই ওদের মস্ত বড়ো বাড়ি। সীতারাম ও শ্রীধর দুজনেই কাপড়ের ব্যবসায়ী। বড়োবাবু, ছোটোবাবু বলেই চেনে এ অঞ্চলের সকলে। দুজনেই খুব সম্মাননীয়। ইদানীং সীতারামের ব্যবসা ভালো চলছে, তাই বোধহয় ঈর্ষার পারদ কিছুটা বেশি চড়েছে।

রাধারানি পানের ডিব্বাটা এগিয়ে দিয়ে বলল ‘নাও দিদি’। পানের খিলি তুলে মুখে পুরে রমলা, বলল— বাড়িতে আজ পুজো করিসনি ছোটো? আমি তো ভাবলাম এবারে তোরা ঘটা করে উৎসব করবি, রং মাখবি। লোকজন ডেকে খাওয়াবি, ঠাকুরপো কলকাতা থেকে ফেরেনি এখনও? হ্যাঁ রে

ওদিককার খবর কী?

রাধারানি মাথা নীচু করে বলল, ‘না দিদি এখনও কোনো খবর নেই। শুনেছিলাম জামাই দিল্লি যাবে, জানি না গিয়েছে কি না। কোনো খবরই পাইনি দিদি। কুমুর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড্ড নিষ্ঠুর মনে হয়। মেয়ের সুখ মা হয়ে বুঝতে পারলাম না। সারাজীবনের জন্য অপরাধী হয়ে গেলাম দিদি।

আজকের শুভ দিনে মা হয়ে চোখের জল ফেলতে নেই ছোটো। কুমু আমাদের কত আদরের। দিনরাত এক করে নিতাই গৌরকে ডাকছি, তা কি বৃথা যাবে! ওরকম ফুলের মতো মেয়ে এই নবদ্বীপে আর খুঁজে পাবে কেউ? ওরা শহরের লোক, তাই খাঁটি হীরের মূল্য দিল না। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছলো রমলা। তিন মেয়ে, দুই ছেলের মা রমলা। বছর আটচল্লিশ বয়স। শরীরের বাঁধনে এখনও যুবতী। বয়স অনুযায়ী ত্বকে ভাঁজ পড়েনি এখনও, এক কথায় সুন্দরী। অন্যদিকে রাধারানিও কিন্তু কম যায় না। দুধে-আলতা গায়ের রং, কোমর অবধি কুচকুচে কালো চুল। শুধু একটা লাল টিপ আর সিঁদুর, তাতেই নবদ্বীপের এই রানিচ্চড়ার নতুন বউদিদের সৌন্দর্যের তুলনা দেওয়া হয় রাধারানিকে দিয়ে। রাধারানির সৌন্দর্যের চর্চা হয় বললে ভুল হবে, চর্চা হয় ওর গুণের। এত সুন্দর হাতের কাজ, দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ঘরের সব কোণেই তার নমুনা ছড়িয়ে।

তবে সবচেয়ে চর্চা হয় যা নিয়ে তা হলো সীতারাম আর রাধারানির দাম্পত্য জীবন। স্বামী-স্ত্রীর এমন মনের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। নারী-পুরুষ যে দুজন দুজনের পরিপূরক তা এঁদের দুজনকে দেখলে বোঝা যায়। প্রায় তেইশ বছর একসঙ্গে পথ হাঁটছে দুজন। পথ যে খুব মসৃণ ছিল তা তো নয়। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে বাবা-মা'র হাত ধরে পালিয়ে আসা সীতারাম বহু কষ্টের দিন দেখেছে একসময়। স্টেশনে গামছা বিক্রি করত জীবনের শুরুতে। সেখান থেকে নিজের চেষ্টায় মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে সুতোর ব্যবসা শুরু। ধীরে ধীরে রানিচ্চড়ায় গঙ্গার পাড়ে জমি কিনে টালির চালের দু-কামরার বাড়ি করেন। সীতারাম যখন রাধারানিকে বিয়ে করে নিয়ে এল তখন সম্বল বলতে ওই দু' কামরার ঘর। আজ সেখান থেকেই তিন তলার এই রাজপ্রসাদ। বাগান, গোয়ালঘর আর নবদ্বীপ ব্যবসায়ী সমিতিতে গদি। যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে একদিন গামছা বিক্রি করত সীতারাম, আজ কলকাতার ট্রেন থেকে যখন নামে লোকেরা ‘ছোটোবাবু’ বলে এগিয়ে এসে হাত থেকে ব্যাগ নেয়। যদিও এর সব কৃতিত্বটুকুই সে রাধারানিকে দিয়েছে। সীতারাম বলে, রাধার হাতের ছোঁয়াতেই আমার মতো চালচুলোহীন মানুষ আজ নবদ্বীপের ছোটোবাবু।

উফ্ বড্ড রোদ! —বালিশের ওপর রাখা নরম গালে রোদের খেলা, ২২ বছরের কুমুর ভালোলাগারই তো কথা, কিন্তু কই? তন্বী মেয়ের শরীর ঢাকা লাল হলুদের সুতিতে। শরীর তো মনের কথা শোনে না। শক্ত হাতে মনের জানলা বন্ধ রাখলেও শরীরে হানা দেয় সময়। বসন্তের হাওয়ায় কপালে এলিয়ে রাখা চুল উড়ছে। মনে পড়ছে অবিনাশের কথা। অবিনাশ টিউশন ক্লাসে আসতো নীলচে রঙের পঞ্জাবি পরে। প্রদীপ স্যার খুব ভালোবাসতেন ওকে। কুমুর মনে পড়ছে অবিনাশকে। সরস্বতী পুজোয় কোচিনে সেই ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকা অবিনাশের মুখটা। কুমুকে খুব ভয় পেত ও। সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মা-মরা ছেলে কোন আশাতেই-বা ছোটোবাবুর মেয়ের দিকে তাকায়! তাও সেবার সরস্বতী পুজোয় অষ্টাদশী কুমুদিনী যখন প্রথম শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছিল সামনে, চোখের পলক ফেলতে পারেনি অবিনাশ। সেই কৃষ্ণকাজল চোখে ধরা দিয়েছিল কুমু, এক অজানা অচেনা শিহরণ বয়ে গিয়েছিল সারা শরীরে। খুব লজ্জায় পালিয়ে এসেছিল কোচিং থেকে। রাধারানি জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে? বললি যে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে কুমু, কী হলো? সেদিন মায়ের মন পড়তে পারেনি মেয়ের চোখের ভাষা। এর ঠিক এক বছরের মাথায় সম্বন্ধ এল কলকাতা থেকে। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লোক, উঁচু বংশ। কলকাতায় নিজস্ব তিনতলা বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি। ছেলের বাবা স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ছেলে ব্যবসায়ী— এই শুনেই সীতারাম একপ্রকার হ্যাঁ করে দিল হরিহর কাকাকে। হরিহর গোটা নবদ্বীপের নারদমুনি। চার হাত এক করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে স্বস্তি দান করাই তার পেশা।

অতএব, গোটা রানিচ্চড়া জেনে গেল কুমুকে কলকাতা থেকে দেখতে আসছে। আদরের কুমু গিয়েছিল গানের ক্লাসে। সদ্য কেনা তানপুরা নিয়ে রিকশা করে বাড়ির সামনে নামতেই মিনতি এসে তানপুরা হাতে নিয়ে বলল, ‘আর গান শিখতে যেতে হবে না। চলো চলো বাড়ি চলো, দেখো বাবা এসেছেন কলকাতা থেকে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কুমু। বাবার আসার সঙ্গে আমার গান শেখার কী সম্পর্ক? মনে মনে ভাবলো। আয় মা, কাছে আয়। এবার যে আমার উমাকে বিদায় দিতে হবে রে। সীতারামের চোখে আনন্দের জল। রাধারানিকে বলল— বুঝলে রাধা, ছেলেকে দেখে এলাম, একদম নায়ক নায়ক চেহারা। আমাদের কুমুর সঙ্গে খুব মানাবে।

ছেলের বাবা-মাও খুব ভালো মানুষ। ঠিক আমরা যেমনটি চাই। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো ওরাও ভৌমিক বাড়ি, বৈষ্ণব।

বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না। আমাদের কুমুর কোনও অসুবিধাই হবে না। ও ঘরে গেলে সুখী হবে কুমু, দেখে নিও। রাধারানির চোখে তখন স্বপ্ন। কনের সাজে সাজাবে তার ছোট্ট পরিকে। একইসঙ্গে এক অজানা কষ্ট ভিড় করছে মনে। বাবা-মাকে ছেড়ে যে একদিনের জন্যেও কখনও কোথাও থাকেনি কুমু। বড্ড আদুরে ও, নেচে খেলে সারাবাড়ি মাথায় করে রাখে। দুই বোন মিনু আর কেকাকে নিয়ে সারাক্ষণ কুমুই এবাড়ির রাজকন্যে।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। ৯ই অগ্রহায়ণ। ছোটোবাবুর মেয়ের বিয়ে বলে কথা। প্রায় গোটা নবদ্বীপ ভিড় করলো ভৌমিক বাড়িতে। নিমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষার বালাই নেই। যেন সকলেই কুমুকে আশীর্বাদ করতে চায়। বিয়ে সেরে যখন কুমুর বিদায়বেলা, তখন রানিচ্চড়ার মন ভিজে গিয়েছিল চোখের জলে।

'শ্বশুরবাড়ি', ছোটো থেকে শুনে আসা মেয়েদের নিজের বাড়ি। বাবার কাছে আহ্লাদে আবদারে বড়ো হওয়ার পর শুনতে হয়েছে তুই তো মা আমার গচ্ছিত ধন, শ্বশুরবাড়িই তোর আসল ঠিকানা। তাই নবদ্বীপের রানিচ্চড়ার নীল রঙা বাড়ি, গোয়াল ঘর— সবকিছু ফেলে করে কলকাতা শহরের ৩৩নং রসা রোড, টালিগঞ্জ--- এই হলো কুমুর বর্তমান ঠিকানা। এখানে বাড়ি ভর্তি মানুষ, বিশাল বাড়িতে মানুষগুলো সব নিজের নিজের পৃথিবী বানিয়ে নিয়ে আছে দিব্যি। সকলেই খুব মেপে কথা বলে। এবাড়িতে চেঁচিয়ে কথা বলা বারণ, সকলেই খুব মার্জিত। দুই দাদা, বউদি, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি— সকলেই খুব ভালোবাসে কুমুকে, কিন্তু এদের ভালোবাসাটাও মাপা, তাই মনকে ছোঁয় না। বাড়ির মধ্যে একটি মাত্র মানুষ আছে যার সঙ্গে মন খুলে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে কুমু। শৈলেন্দ্র যদিও কুমুর থেকে বয়সে পাক্কা এগারো বছরের বড়ো তাও কুমুর মনটা ও পড়তে পারে। সারাদিনটা প্রায় চুপ করেই কেটে যায় কুমুর। রাতে দরজার এপারে শুরু হয় ওর যত ছেলেমানুষি। নবদ্বীপের গঙ্গার পাড়ে বৈষ্ণবীর গান গেয়ে শোনায় স্বামীকে। আজ সেজদিভাই কী শাড়ি কিনলো, ছাদের টগরফুলের গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা ক্লাসের ইতিহাস দিদিমণি কাবেরীদির বলা নেতাজীর কবিতা— এই সব কিছুর বন্ধু এখন শৈলেন্দ্র। কলকাতার কংক্রিটের বদ্ধ পরিবেশ যখন কুমুকে একঘেয়ে করে তোলে, মনে পড়ে যায় রানিচ্চড়ার বন্ধুদের সঙ্গে পোড়ামাতলার মেলা বা একসঙ্গে দল বেঁধে গঙ্গায় স্নান করা। মুখে কিছু বলে না কুমু কিন্তু শৈলেন্দ্র ঠিক বুঝতে পারে ওর কষ্ট। কুমুকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে বাবুঘাটের গঙ্গার ধার বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। দিব্যি চলছিল দুজনের। দুজনার মাধুর্যে দুজনে মগ্ন হয়ে শুরু করেছিল পথ চলা। ভালোবাসা ধরা দিয়েছিল ওদের আঙিনায়। 'শ্বশুরবাড়ি' নিজের বাড়ি হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

রানিচ্চড়ার গঙ্গার মাঠ, পোড়ামাতলা, গানের ক্লাস, অবিনাশ সব আবছা হচ্ছিল স্মৃতিতে। কিন্তু বাধ সাধলো বোধহয় বিধি। ছোটো ছোটো কারণে অশান্তি শুরু হলো। হয়তো নব দম্পতির সুখের জ্বালা ধরালো অন্যদের। সংসার বড়ো বিচিত্র জায়গা, এখানে অপ্রিয় সত্যের জায়গা নেই। কুমু বুঝেই উঠতে পারে না পরীক্ষার প্রশ্ন, তার আগেই ফলাফল বেরিয়ে যায়। এক বছরের মাথাতেই নতুন বউয়ের গন্ধ কেটে গেল গা থেকে, কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হচ্ছে ক্রমশ। প্রজাপতির মতো ডানা মেলতে চাওয়া ইচ্ছেগুলোকে হঠাৎ হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে হচ্ছে। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কিছুই বুঝে ওঠার আগে একদিন সকালে শাশুড়ি মা জিদ ধরে বসলেন, কুমুকে তাঁর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

অপরাধ— সে মুখে মুখে তক্ক করেছে। তুমুল অশান্তি শুরু হলো। শৈলেন্দ্র মায়ের দিক নেবে না বউয়ের। বাড়ির অন্যান্যরা তখন আগুন নেভানোর বদলে তাতে ঘি ঢালছে। হঠাৎ ঘটে গেল সেই অযাচিত ঘটনা। শৈলেন্দ্র মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে কুমুর গালে চড়

বসিয়ে দিল। ছোটো থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কখনও যে কুমুকে জোরে কথা পর্যন্ত বলেনি, সেই কুমু সকলের সামনে এই অপমান মেনে নিতে পারল না। পায়ের তলা থেকে মাঠি সরে যেতে লাগল, মাথা কাজ করছে না কুমুর। চারদিকটা অন্ধকার। খালি পায়ে বাড়ির সদর দরজা খুলে সোজা হাঁটা দিল, গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। পিছন থেকে ডাকছে সবাই কুমুদিনী-কুমুদিনী...। কুমুর যেন কোনোকিছুই কানে ঢুকছে না। যাঁকে জীবনের সব কিছু দিয়েছে, মনের আসনে বসিয়েছে সেই শৈলেন্দ্রর এরকম— না কিছুতেই সম্ভব নয় মেনে নেওয়া। অনেক কথার ঝড় উঠছে মনের মধ্যে। হঠাৎ হাতটা চেপে ধরল শ্বশুরমশাই। ফিরিয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে। শাশুড়িমা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিধান। কাল সকালেই কুমুকে রেখে আসবি শৈল, নইলে আমার মরা মুখ দেখবি'।

দুপুরের রোদ তার স্বভাব নিয়ে বিছানা ছাড়িয়ে ঘরের মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। কুমু এখনও অলস, সকালের রেশ ছাড়তে পারেনি। আজই তো সেই দিন, তিন বছর আগে আজকের দিনেই শৈলেন্দ্র রেখে গিয়েছিল ওকে। সেদিন ও বুঝেছিল ওর নিজের বাড়ি বলে কিছু নেই। বাবা বলেছিলেন খুব অন্যায় করেছো, বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়েছো— ওরা তো ঠিকই করেছেন তোমায় ফেরত দিয়ে। মা বলেছিলেন— আমার শিক্ষায় কোথায় খামতি থেকে গেল কুমু? একাজ তুই কী করে করলি? ভাই-বোনেরা দরজার আড়াল থেকে দেখেছিল, কাছে আসেনি কেউ। যেন কী ভয়ংকর অপরাধ করে ফেলেছে ও। ওপরের তিনতলার ঘরে ঠাঁই হয়েছিল কুমুর। বাড়ির সবচেয়ে আহ্লাদি মেয়েও তখন বাড়ির ব্রাত্য। কিছুদিনের মধ্যেই কুমু বুঝতে পারল সে মা হতে চলেছে। ভয়, আনন্দ, সংশয় সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল কুমুর। গোটা রানিচ্চড়ায় তখন সমালোচনার ঝড়।

মিনতি ডাক দিল— কুমুদিদি, এবার ওঠো, কত বেলা হয়েছে জানো, যাও স্নানে যাও। মিঠাইকে স্নান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। কুমু বিছানা ছেড়ে গায়ের আঁচল ঠিক করে নীচে নামলো। মনের ভার মুখের সৌন্দর্যকে ক্রমশ কঠিন করে দিয়েছে। স্নানের ঘরে ঢুকে যেন স্মৃতির ঝড় উঠছে। সাবানের বুদবুদ মনে করিয়ে দিচ্ছে শৈলেন্দ্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো। একসঙ্গে ছায়াপথ হেঁটে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি। কত ঠুনকো, বুদবুদের মতোই মিলিয়ে গেছে তারা। মাঝে শুধু দুবার ফোন এসেছিল কলকাতা থেকে। ওপার থেকে শুধু একটাই প্রশ্ন ছিল, 'মিঠাই কেমন আছে? অভিমানের পারদ জমে বোবা হয়ে গিয়েছিল কুমু, উত্তর দিতে পারেনি।

তবে আজ নিজের কাছেই নিজের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পালা। নিজের অস্তিত্বের মূল্য দিতে হবে নিজেকেই। পরমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকা আর নয়। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। হাইসেকেন্ডারিতে নবদ্বীপের তারাসুন্দরী বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিল কুমু। খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে বোর্ডিঙে থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবে।

স্নান সেরে বেরিয়ে কুমুদিনী সোজা ওপরের ঘরে গেল। আলমারি থেকে গতবার পুজোতে বাবার দেওয়া হলুদ শাড়িটা বার করে পরল। আজ সুন্দর করে সেজেছে ও, শুধু নিজের জন্য। নীচে নেমে মিঠাইকে কোলে নিয়ে সীতারামের ঘরে গিয়ে দেখল, সীতারাম চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। —'বাবা আমি কলকাতা যাবো', সীতারাম এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুমুর দিকে। কী বললি মা, সত্যি! যাবি কলকাতা? খুব ভালো ভেবেছিস মা। সত্যি তো, ওটা তো তোর স্বামীর ঘর। নিজের অধিকার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। তোর মাকে ডাক। রাধা খুব খুশি হবে তোর সিদ্ধান্তে। আমরা তো কবে থেকেই তোকে বুঝিয়ে বলছি মা। আমাদের সমাজে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয় চার কাঁধে চড়ে, বুঝলি? যা হয়েছে সব ভুলে যা, ওখানে গিয়ে শ্বশুর শাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি। ওরা শিক্ষিত মানুষ, ওরা ঠিক তোকে ঘরে তুলে নেবে। আর আমাদের জামাই তো খুবই ভালো মানুষ, বাড়ির চাপে পড়ে তোকে ঘরে নিতে পারছে না। কই গো শুনছো— রাধা একবার এ ঘরে এসো, দেখো তোমার মেয়ের মতি ফিরেছে এতদিন।

বাবা, তুমি ভুল ভাবছো। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ আমার আছে কিন্তু ৩৩নং টালিগঞ্জ পাড়ায় নয়। সুধীর মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম খোঁজ নিতে, উনি কলেজের ফর্ম নিয়ে এসেছিলেন। ফার্স্ট লিস্টে নাম উঠেছে। আমি ঠিক করে নিয়েছি বাবা, 'কলকাতার কলেজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবো, বায়ো-কেমেস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে। তোমার উমা বড়ো হয়ে গেছে বাবা, সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তুমিই তো আমার আদর্শ, প্রেরণা। তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার কুমু যেন পারে। তবে, একটা কথা, যতদিন না এই সমাজের বুকে একটা জায়গা করে নিচ্ছি ততদিন মিঠাইকে রেখে যাব তোমার কাছে, তোমার গচ্ছিত ধন। তবে মিঠাইকে আমি অন্যের গচ্ছিত ধন ভাবি না। মিঠাই আমার, একান্ত আমার।

মিঠাই আমার স্বপ্ন, ওকে নিয়েই বাঁচবো আমি। সমাজে ও যেন মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে, সেই পথটাই তৈরি করতে যাচ্ছি কলকাতা। মনের একটা ইচ্ছের কথা তোমায় আজ বলব। বাবা, ভবিষ্যতে একটা বাড়ি বানাতে চাই আমি। নাম দেব— 'একান্ত আপন'। যা মিঠাইয়ের একান্ত নিজের হবে, যা হবে সুখের নীড়। যে ঘর থেকে কেউ ওকে চলে যেতে বলবে না কোনোদিন, যেখানে ফিরে এলেও কেউ প্রশ্ন করবে না ওকে।

ঈশ্বরীপুরে দেবী যশোরেশ্বরী

বিখ্যাত যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর প্রাচীন জনপদে অবস্থিত। উল্লেখ্য, ঈশ্বরীপুর বর্তমান যশোর শহর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। (বর্তমান যশোর শহরে কোনো যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির নেই।) জনশ্রুতি অনুযায়ী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময় তন্ত্রচূড়ামণি উল্লিখিত (প্রাচীন) যশোর অর্থাৎ বর্তমান ঈশ্বরীপুরে আবাদকালে মাটিতে অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয় এবং সেইখানেই মন্দির নির্মাণ করা হয়। আরও জানা যায়, প্রতাপাদিত্যের আগে অর্থাৎ আট শতকে এখানে মন্দির ছিল। অর্থাৎ পীঠস্থান ও মূর্তিটি যথেষ্ট প্রাচীন। তবে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। পরবর্তীতে প্রতাপাদিত্য মন্দির নির্মাণ করান।

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলা হয়েছে—

'যশোরে পাণিপদ্ম দেবতা যশোরেশ্বরী,
চণ্ডশ্চ ভৈরব যত্র তত্র সিদ্ধি ন সংশয়।'

'যশ' শব্দের অর্থ কীর্তি বা খ্যাতি এবং 'রঃ' শব্দের অর্থ আগুন বা তেজ। সুতরাং যশ + রঃ = যশরঃ-এর ঈশ্বরী হচ্ছেন যশরেঈশ্বরী বা যশোরেশ্বরী।

কথিত আছে, দেবীর মূর্তি জ্বালাময়ী বা তেজময়ী বলে মন্দিরের ছাদ থাকত না। তেজ বের হওয়ার জন্য ছাদ ফেটে যেত। তাই মন্দিরের ছাদে চিমনির মতো ফাঁক রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, মায়ের মূর্তিটি কষ্টিপাথরের নির্মিত ভয়ংকরী কালীমূর্তি। বিশেষ করে কালীপুজো ও অন্যান্য উৎসবে দেবীর পুজো সাড়ম্বরে হয়।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

বামপন্থা ভয়ংকরী

আজ বাঙ্গলায় উন্নয়নের পরিবেশকে ব্যাহত করতে এবং রাজনৈতিক ময়দানে সহানুভূতির মাটি পেতে আনিসকে নিয়ে যে ভয়ংকরী কর্মসূচি বামপন্থীরা গ্রহণ করেছে, তাতে তাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে ছেলেখেলা ও উত্তপ্ত পরিবেশ গড়ে তোলার মানসিকতাই প্রকাশ পাচ্ছে। আজ আনিস যদি আশিস হতো, তাহলে বামপন্থীদের কাছে এটা কোনো ইস্যুই হতো না, যেমন পূর্ববঙ্গে পুজোর মরশুমে সে দেশের হিন্দু সমাজের উপরে নির্যাতন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করছে। আবার ঠিক তেমনিই আজ বামপন্থী চেতনার রাশিয়া যে ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তাও কোনো ইস্যু নয় অন্তত বামপন্থীদের দিক থেকে। এই আক্রমণ যদি রাশিয়ার বদলে আমেরিকা করত, তবে বাঙ্গলার বুকে মহাবিপ্লবের যে মহড়া শুরু হতো, তাতে পারমাণবিক বোমার চেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ংকর রূপে বাঙ্গলার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত। বাস্তব সত্য কথা যে, এই বামপন্থী নেতাদের বেশিরভাগই, খুলনা, যশোর, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রামে তাদের মাতৃভূমিতে কেনই বা এই বামপন্থার বীজ বপন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে কারণ আজও যেমন রসহ্যময় রয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনিই মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের পিতা নগেন্দ্র কুমার শূরের মৃত্যু রহস্যও। সত্যিই বামপন্থা যে কোনো জাতির পক্ষে ভয়ংকর।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

আনিসের মতো ওই ব্যবসায়ী প্রোমোটারও বিচার চায়

আমরা কি কোনো গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি, না মুঘল রাজত্বে? নেতা নেত্রীর দল, বুদ্ধিজীবী, মিডিয়াজীবী সবাই কি মুঘল বংশধর? আনিস খানের মৃত্যুর জন্য যে রাজ্য রাজনীতিতে আন্দোলনের বন্যা বইছে, মনে হয় মিডিয়াতে বান এসেছে। নেকড়ের দলের মতো তারা এখন রক্তের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া বারুইপুর বেগমপুরের এক প্রমোটারকে একদল দুষ্কৃতী গাছে বেঁধে পৈশাচিক ভাবে পিটিয়ে মারে, কারোর মুখে কোনো টুঁ শব্দ নেই। আমরা যতই হতবাক, তারা ততই নির্বাক। ওই ব্যবসায়ী ছিলেন একজন হিন্দু। এখন থেকে এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হবার জন্য যে এভাবে আমাদের জিজিয়া কর দিতে হয়।

কর্ণাটকে হিজাব বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু মুসকানকে যে কলেজের পোশাক বিধি লঙ্ঘন করে হিজাব পরে আল্লা-হু- আকবর ধ্বনির তোপ দেগে এখন সর্বত্র পুরস্কৃত হচ্ছে। অন্যদিকে যে ছেলেটি গেরুয়া বসন পরে হিজাবের বিরোধিতা করেছিল তার লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা এখন কোথায় বাস করছি, বাংলাদেশে না অন্য কোথাও, আফগানিস্থানে?

ওই ঘটনা থেকে দুজন মুসলমান ছেলে-মেয়ের নাম জানা গেল কিন্তু হিন্দু ছেলে দুটোর নাম জানা গেল না যারা ঘটনার শিকার, কিন্তু কেন? বিস্ময় জাগে। এখন যে মুঘল রাজত্ব চলছে। কার জন্য যে কখন কতটুকু চোখের জল পড়বে তা ওই মুঘলরা ঠিক করে দেয়। চোখের জল পড়বে না, এখন মুঘলদের ওই বংশধররা ঠিক করে দেয়। হুজুর, আনিস খানের মতো ওই ব্যবসায়ী প্রোমোটার মুসকানের মতো ওই ছাত্রটাও পুরস্কৃত হতে চেয়েছিল।

—সুবল সরদার
, মগরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

বামেদের বিধি বাম

গত বছর (২০২১) বামপন্থীদের নবান্ন অভিযানে পুলিশের মারে মারা যায় মুসলমান যুবক মইদুল ইসলাম। আবার এ বছর (২০২২) পুলিশের হাতে মারা যায় একজন মুসলমান যুবক আনিস খান। প্রতিবারই বামপন্থী নেতারা এই মুসলমান যুবকদের মৃত্যু নিয়ে আন্দোলনের রাজনীতি করে চলেছেন। ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে বামপন্থীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিবারই কোনো না কোনো মুসলমান যুবকের প্রাণের বলি দিয়ে রাজনীতিতে নিজেদের শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইছেন। প্রতিবারই মৃত্যু হচ্ছে কোনো না কোনো মুসলমান যুবকের। আর বহাল তবিয়তে তা নিয়ে রাজনীতি করছেন হিন্দু নামধারী আলট্রা

ফঃ ৩

মডার্ন ক্রীতদাস বাম নেতারা। দেখা যাচ্ছে, প্রতিবারই বামপন্থী নেতারা আন্দোলনের নামে বলির পাঁঠা করছেন মুসলমান যুবকদের। আর বহাল তবিয়তে থেকে যাচ্ছে হিন্দু নামধারী সেকুলার বাম নেতারা। কোনো হিন্দু বাম নেতার এহেন আন্দোলনের মাঝে পুলিশের মারে মৃত্যু কিন্তু হয়নি। প্রত্যেকবারই বলির পাঁঠা হয়েছেন কোনো মুসলমান যুবক তা সে মইদুল হোক অথবা আনিস। এর কারণ সংখ্যালঘুদের বা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য আন্দোলন বামেদের কখনোই ছিল না বরং মুসলমান ও জনজাতি মানুষদের শিখণ্ডী করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই বামপন্থীদের মূল উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার মুসলমান ও জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের এটা বোঝা উচিত। হিন্দু জনজাতিকে হিন্দু না বলে অদিবাসী অথবা মুসলমানকে দেশদ্রোহী ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ বামপন্থীরাই প্রচলন করে। যাতে করে ভারতীয় সমাজ বিভাজিত থাকে এবং বামপন্থীদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। বলাবাহুল্য, অনেকাংশে তারা সফলও হয়েছে। এখন সমাজ জাগরিত হচ্ছে এবং বিষাক্ত বামপন্থাকে মানুষ দ্রুতগতিতে বহিষ্কার করছেন। আজ তারা শূন্যের দোরগোড়ায়, আগামীতে নিশ্চিহ্ন হবেই। এটাই বিধির বিধান।

—**শুভ শীল,**
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

পশ্চিমবঙ্গের ১০৮ পৌর নির্বাচনের অঙ্ক

তৃণমূলের বিপুল জয়, বিজেপির তদ্রুপ পরাজয়। কিন্তু কেন? বাঙ্গলার মানুষ কি বিজেপিকে চায় না? নাকি বিজেপির নীতি আদর্শ বাঙ্গলার মানুষজন পছন্দ করছেন না? এর কোনোটাই ঠিক নয়। আসলে এই কথাগুলো রাজ্যের শাসকদল টিএমসি-র কথা। কিন্তু কেন? টিএমসি-র নজর নরেন্দ্র মোদীর কুর্সিটায়। তাই নিজেকে বড়ো করতে বিজেপিকে ছোটো করা। তাতে তারা যে সিপিএম বা বামফ্রন্টকে দুচক্ষে দেখতে পারে না তারাও যদি সঙ্গে করে কংগ্রেসকে নিয়ে রাজনীতির ময়দানে ভেসে ওঠে তাতেও রাজি। সেই জন্যই তো বিমান বসুদের নবান্নতে ডেকে ফিসফ্রাই খাইয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি ও অনুব্রত মণ্ডল তো সরাসরি সিপিএম নেতাদের পার্টি অফিস খুলে রাজনীতি করতে খুল্লামখুল্লা আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেটা কি এমনি এমনি? তার পিছনেও ছিল একটা অঙ্ক। ওই দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি।

তাইতো উত্তরপ্রদেশ বিধান সভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী না দিয়েও জোকারের মতো প্রচার করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য : ‘আমি বিজেপিকে রুখে দিয়েছি।’ এখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তো নবান্নের তোতা পাখি। সে তো চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না। একটা অসাড় শরীরমাত্র। এখানে পুলিশ দলদাস। তারা টিএমসির ভয়ে টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়ে। আর বিরোধী বিজেপির বেলায় লাঠি বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে আসে। যেসব সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া তাদের কথা শোনে না তাদের ভয় দেখায়, সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করে। এ সব কিছুই করছে বিজেপিকে হেয় করার জন্য। তিনি ভালো করেই জানেন নরেন্দ্র মোদীর চেয়ারটা পেতে গেলে সিপিএমের হাত টিএমসির রক্তে রঞ্জিত হলেও তাদেরও কংগ্রেসকে প্রয়োজন। আর দার্জিলিঙে হামরো পার্টিকে ওয়াক ওভার দিয়ে গণতন্ত্রের ডঙ্কা বাজানো যাবে। তাতে বিজেপির ভোট লুটের তত্ত্ব মাঠে মারা যাবে। বিরোধী বিজেপিতে জয়প্রকাশের মতো দালালদের দিয়ে ঝগড়া তো বাঁধিয়ে দিয়েইছেন। বিধানসভা নির্বাচনের পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা করেছেন। বিজেপির উচিত নতুন করে দলের সবাইকে নিয়ে অল আউট রাজনৈতিক আন্দোলনে এখনই নেমে পড়া।

—**শ্যামল হাতি,**
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

ভোটলুঠে আস্থা তৃণমূলের

দ্বিতীয় দফার পুরভোটের বিরোধীদের কার্যত চুপ করিয়ে রাখলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ বাহিনী। ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন, ’১৯-এর লোকসভা, ২১-এর বিধানসভার পর ২২-এর পুরভোটের, পাড়ার নির্বাচনেও মমতাবাহিনীর ভোট সন্ত্রাস অব্যাহত। ২ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দফার ১০৮ পুরভোটের ১০২ তৃণমূলের দখলে। ত্রিশঙ্কু-৪, সিপিএম-১ ও হামরো পার্টি-১। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও শুধুমাত্র ছাপ্পা, ভোটলুঠ ও পেশী শক্তির জোরে বিরোধীদের অস্তিত্ব নাকচ করে দেওয়া যায়, তৃণমূল কংগ্রেস তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গত বছরের বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআই তৎপরতার পরেও তৃণমূলের সন্ত্রাস কিন্তু থেমে নেই। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের কণ্ঠ ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসছে। ২৭ জানুয়ারি নির্বাচনের দিনই খবর পেলাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর পুরসভার ১০.১১.১২নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীদের তুলে নিয়ে গেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ তাদেরই উপর চড়াও হয়। তার মধ্যে ১০নং ওয়ার্ডের প্রার্থী শঙ্কর চক্রবর্তীর বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে লুঠ করে। বোমা পর্যন্ত ছুঁড়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের পাড়ায়-পাড়ায় পুলিশের সামনে তৃণমূলের বাইকবাহিনী দাপিয়ে বেরিয়েছে। বারাকপুর, বালুরঘাট, বর্ধমান টিটাগড়, বারুইপুর সর্বত্রই ব্যাপক অশান্তি দেখেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। অথচ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সদর্প ঘোষণা, বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া, দ্বিতীয় দফার পুরভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। এটা প্রশাসন না প্রহসন, মাঝে মাঝে তার তফাত বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

গায়ের জোরে ভোট ময়দান জিতে প্রায় ৯৪ শতাংশ পুরসভাই দখল করে নিয়েছে তৃণমূল। তিরিশেরও বেশি পুরসভা বিরোধীশূন্য। এমনই গণতন্ত্রের অবস্থা। যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার গড়ে বিজেপি প্রার্থীদের পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হচ্ছে। এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ যে খুব স্থিতিশীল নয়, তা স্পষ্ট।

—**স্নেহলতা পোদ্দার,**
ধনেখালি, হুগলী।

আত্মনির্ভরতার এক নাম শ্যামাদেবী চৌহান

সুতপা বসাক ভড়

নারী শক্তি সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা। এই অমোঘ সত্যটি আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। অথচ আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেবীস্বরূপারা আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের কার্যকুশলতা, আত্মনির্ভরতা আমাদের উৎসাহিত করছে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে, আত্মনির্ভর হতে। এমনই একজন মহিলা হলেন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন স্থিত বিকাশনগর ব্লকের ফতেপুর গ্রামের শ্রীমতী শ্যামাদেবী চৌহান।

শ্যামা ছিলেন একটি সম্পন্ন পরিবারের গৃহবধূ। তাঁর বাড়ি-ঘর সব কিছু ছিল। স্বামী ত্রিলোক সিংহের একটি অটো স্পেয়ার পার্টসের দোকান ছিল। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ একজন পরিচিত ব্যক্তি তাঁদের ঠকিয়ে দেয় বাড়ি বিক্রি করে বসত। স্বামীর কাজও বন্ধ হয়ে যায়। সামান্য অন্ন সংস্থান করাও তাঁর কঠিন হয়ে পড়ে। এর ওপর ওইসময় বাড়ির মহিলাদের বাইরে কাজ করতে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল। তাসত্ত্বেও শ্যামাদেবী ওইসব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠে ওই বিষম পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তাতে সফল হন। বর্তমানে তিনি একটি সংস্থার মালিক শতাধিক মহিলা তাঁর সংস্থায় কাজ করছেন। শ্যামাদেবীর কঠোর মনোবল ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজ তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী।

২০১২ সালের মার্চমাসে তিনি মহিলা জাগৃতি স্বয়ং সহায়তা গোষ্ঠী গঠন করেন। কিন্তু পরিবারের অসুবিধার জন্য মাত্র দু'মাস পরেই তা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এজন্য, তিনি ব্লক মুখ্যালয় বিকাশনগর যান। সেখানকার আধিকারিকরা তাঁকে রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন (এন আর এল এম) সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ওই প্রকল্পটি আবার নতুন করে শুরু করে তোলার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ সংস্থান

থেকে পাটের তৈরি ব্যাগ ও ফাইল ফোল্ডার বানানোর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর স্বয়ং সহায়তা প্রকল্পতে ছ'জন মহিলাকে যুক্ত করে কাজ শুরু করেন। এজন্য তিনি ২৫ হাজার টাকা ধার নেন। আরও মহিলা এই প্রকল্পে যুক্ত হতে থাকেন। প্রকল্পটি বড়ো হতে থাকে। বর্তমানে সংস্থাটি পাটের তৈরি ব্যাগ, ফাইল ফোল্ডার ইত্যাদি তৈরি করে মাসে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা দাঁড় করায়।

বর্তমানে মহিলা জাগৃতি স্বয়ং সহায়তা গোষ্ঠীতে ফতেপুর, জম্মোবালা, ঢকরানি, শেরপুর, ভুট্টী প্রভৃতি গ্রামের শতাধিক মহিলা যুক্ত আছেন। তাঁদের মাসিক আয় পাঁচ থেকে পনেরো হাজার টাকা। মহিলা জাগৃতি স্বয়ংসহায়তা গোষ্ঠীর সদস্যরা গোলাপি রঙের বস্ত্র পরেন। শ্যামাদেবী তাঁদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্তর উন্নত করার জন্য প্রেরণা দেন।

এক সময় তাঁর ফতেপুর গ্রামের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছিল। পরে শ্যামা ওই গ্রামেই আবার বাড়ি বানান। একসময় অর্থাভাবে তাঁর বড়োমেয়ে শিল্পা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরে সব যখন স্বাভাবিক হয়, তখন শিল্পা হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করে পাশ করে। বর্তমানে চণ্ডীগড়ে কর্মরতা। ছোটো মেয়ে শিখা এমবিএ এবং ছেলে আয়ুস আইনের ছাত্র। স্বামী ত্রিলোক সিংহ তাঁর প্রকল্পে হিসেবের কাজ দেখাশুনা করেন।

এন আর এল এম দেরাদুনের জেলা প্রবন্ধক জানিয়েছেন যে, মহিলা জাগৃতি স্বয়ংসহায়তা গোষ্ঠী বর্তমানে পাটের তৈরি ব্যাগ, ফাইল ফোল্ডার, আচার, জুস, অ্যালোভেরা জেল, টেক হোম র‍্যাশন ইত্যাদি উৎপাদন করে। এগুলি রুদ্রপ্রয়াগ, টিহরি, পৌড়ী, দেরাদুন জেলাতে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। অন্যান্য মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে উৎসাহিত করে এই মিশন।

শ্যামাদেবী চৌহান উত্তরখণ্ডের প্রথম মহিলা মাস্টার ট্রেনার, যিনি প্রদেশের বাইরেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কৃষি ও প্রৌদ্যোগিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করেছে। ২০১৯-এ মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওত রাজ্যস্তরীয় পুরস্কার প্রদান করেছেন। তবে নিজে আত্মনির্ভর হয়ে অন্য মহিলাদের মনেও আত্মনির্ভরতার আশা জাগিয়েছেন শ্যামাদেবী চৌহান— এটিই হলো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। □

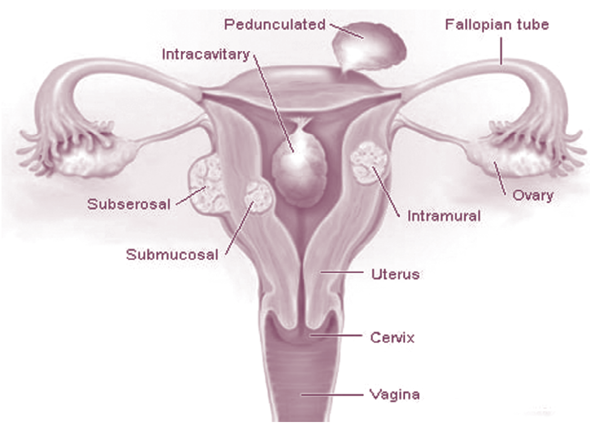

স্ত্রীরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বর্তমানে দেশে বেশ কটি স্ত্রীরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, এর মধ্যে যে কটি রোগের প্রকোপ বেশি এবং আমাদের মহিলা সমাজের ভগ্নস্বাস্থ্য ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ, সেগুলো হলো— (ক) সেপটিক অ্যাবরশন, (খ) পিআইডি, (গ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি, (ঘ) ডিইউবি, (ঙ) ফাইব্রয়েড ইউটেরাস, (চ) জরায়ু-গ্রীবার ক্যানসার বা ক্যানসার সারভিক্স। এর সবই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে এগুলো থেকে এবং এসবের পরবর্তী জটিলতা থেকে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

সেপটিক অ্যাবরশন : নানা কারণেই একজন মহিলার অ্যাবরশন বা গর্ভপাত ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা হওয়া উচিত স্বাস্থ্যকর উপায়ে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে যাতে গর্ভবতীর স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় এবং কোনো মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশে তার উলটোটাই ঘটছে বেশি। তথাকথিত ‘ক্লিনিক’ নামধারী কিছু প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এমআরের নামে অ্যাবরশন বা গর্ভপাত করানো হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার মা এই গর্ভপাতজনিত জটিলতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, না হয় নানাধরনের ক্রনিক ইনফেকশনের শিকার হন, যার ফলে চিররুগ্ন হয়ে এক অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হয়।

পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ বা পিআইডি : এই রোগে মহিলারা তলপেটের অস্বাভাবিক ব্যথায় কষ্ট পান, বিশেষ করে মাসিক ঋতুস্রাবের সময়। ঋতুস্রাব মাত্রাতিরিক্ত হয়। অনেকক্ষেত্রে মাসে দু’তিনবার হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে পলিমেনোরিয়া বলে। এটি একটি গর্ভপাতের রোগ এবং এ ধরনের সংক্রমণ ও প্রদাহ সাধারণত অস্বাস্থ্যকরভাবে গর্ভপাতের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয়। এ থেকে নানারকম মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে অস্ত্রোপচারে জরায়ু ফেলেও দিতে হয় যাকে বলে অ্যাবডমিনাল হিসটেরেকটমি। ফলে অকালেই অনেক মেয়েকে মা হওয়ার স্বপ্ন চিরতরে বিসর্জন দিতে হয়।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি : এটি আরেকটি জটিল স্ত্রীরোগ। এই রোগটি দেখা দেয় ঘন ঘন সন্তান প্রসবের ফলে। সন্তান প্রসবের সময় আনাড়ি দাই বা ধাত্রীর টানাহেঁচড়ার কারণে জরায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সংক্রমণ ঘটে, যার ফলে জরায়ু স্থানচ্যুতি বা ইউটেরাইন প্রলাপস দেখা দেয়। এ ধরনের জটিলতা দেখা দিলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ডিএইবি বা ডিস ফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লিডিং : এ রোগের ফলে মহিলাদের দেহে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এর কারণে অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব বার বার হয়।

ফাইব্রয়েড ইউটেরাস : এ জাতীয় টিউমার দেখা দিলে মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দেখা দেয় এবং অনেকক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় ও শেষের দিকে প্রায় সব সময় তলপেটে অসহ্য ব্যথা হয়। এ ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই করতে হয়, কারণ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে টিউমার অপসারণ না করলে পরবর্তীকালে এ ধরনের টিউমার থেকে ক্যানসার হতে পারে এবং রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে।

জরায়ু-গ্রীবার ক্যানসার : এটি একটি মারাত্মক রকমের জটিল স্ত্রীরোগ। আমাদের দেশে অনেক মহিলাই এই মারাত্মক রোগের শিকার হয়ে থাকেন। এই রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা না পড়লে এবং জটিল পর্যায়ে চলে গেলে অস্ত্রোপচার করাও সম্ভব হয় না এবং অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে রোগী তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই রোগের উপসর্গগুলো সংক্ষেপে এরকম— মাসিক ঋতুস্রাব পরিমাণে বেশি হওয়া, অনেক ক্ষেত্রে অজস্র রক্তক্ষরণে রোগিনী রক্তশূন্য হয়ে পড়েন। তলপেটে ও কোমরে ভীষণরকমের যন্ত্রণা হয়, কারণ শেষের দিকে কোমরের হাড় ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ায় স্নায়ুতন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার কারণে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে এই রোগ দেখা দেয়। তাছাড়া বিরতি না দিয়ে ঘন ঘন সন্তান প্রসবও এর অন্যতম কারণ।

স্ত্রীরোগ ছাড়াও মহিলারা নানা ধরনের যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া মূত্রনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি। এসব রোগের বিস্তার খুব বেশি এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো যে, মহিলাদের স্বামী ঠিকমতো হিস্ট্রি দিতে এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে চান না। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনই আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং উভয়েরই চিকিৎসা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়শ দেখা যায়, স্বামী নিজে চিকিৎসা নিতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সহজেই হয়ে যায়।

বিষের পেয়ালায় অমৃতপান

নিখিল চিত্রকর

‘কেনু সঙ্গ খেলু হোলি/প্রিয়া ত্যাজ গয়ে হেঁ আকেলি...’ —ভজনটির রচয়িতা কৃষ্ণপ্রেমে পাগল চিরন্তন বিরহিনী মীরাবাঈ। সারাটা জীবন ধরে যে মহীয়সী কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্কাম সাধনার বিনি সুতোর মালা গেঁথে গেছেন পরম যত্নে। অধ্যাত্মলীলার বিচরণ ভূমি এই ভারতবর্ষের অগণিত সাধকের মধ্যে অন্যতমা মীরা। যিনি রাধার মতোই কানাইয়ের প্রেমে ‘মগন’ হয়ে স্নেহের অঝোর ধারা বর্ষণ করেছিলেন। এ প্রেম শাশ্বত। এ প্রেম আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তের নৈবেদ্য। এ প্রেম অমরত্বের শিখরে প্রতিষ্ঠিত।

উপরে ভজনটির রচনাকাল ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশেই হবে। তার প্রায় ৪৫০ বছর পর ১৯৭৪ সালে পণ্ডিত হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে, ‘চলা ওয়াহি দেশ’ ছবিতে ‘কেনু সঙ্গ খেলু হোলি’ গাইলেন লতা মঙ্গেশকর। মীরার কৃষ্ণপ্রেম এভাবেই পৌঁছে গেল সময় যন্ত্রে ভ্রমণ করে যুগ থেকে যুগান্তরে।

গুগল তার তথ্য ভাণ্ডার ঘেঁটে জানাচ্ছে, মীরাবাঈ একজন হিন্দু অতিন্দ্রীয়বাদী, সংগীতশিল্পী ও সহজিয়া কৃষ্ণভক্ত। অতিন্দ্রীয়বাদী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বা ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির বাইরে যার বিচরণ। ভারতীয় ভাবধারায়, সংস্কারে বেড়ে ওঠা মীরার পার্থিব জীবনে সেই অর্থে কোনও গণ্ডি ছিল না। আসলে সেই গণ্ডি মীরা নিজেই পেরিয়ে গিয়েছিলেন। যে উপাসনা, যে আরাধনায় তৎকালীন সমাজে শাসন ও পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, মীরা তাঁর ভক্তিধারায় সেসব একের পর খণ্ডন করে গেছেন। রক্তমাংসের মানবী হয়েও স্বীয় অধ্যাত্ম ক্ষমতায় আপন আধারে ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি আনতে পেরেছিলেন তিনি।

মীরাবাঈয়ের জন্ম ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে। যোধপুরের, পালি জেলার কুড়কিতে এক রাজপুত পরিবারে। ঠিক যে বছর পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা, ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হয়ে উপনিবেশ স্থাপনের তোড়জোড় করছে সেই বছরই মরুপ্রান্তে আবির্ভাব মীরার। যিনি পরবর্তীতে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের সন্তধারার অন্যতম প্রধান হয়ে উঠবেন।

পণ্ডিত শ্রীনবিদাসের লেখা ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে মীরার জীবন কাহিনির বিবরণ পাওয়া যায়। অল্প বয়সে মাতৃহারা মীরার বেড়ে ওঠা পিতামহ ও পিতামহীর কাছে। পিতামহ রাও দুদাজি ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসক। কিশোরী বয়স থেকেই মীরার মধ্যে স্পষ্ট হতে থাকে

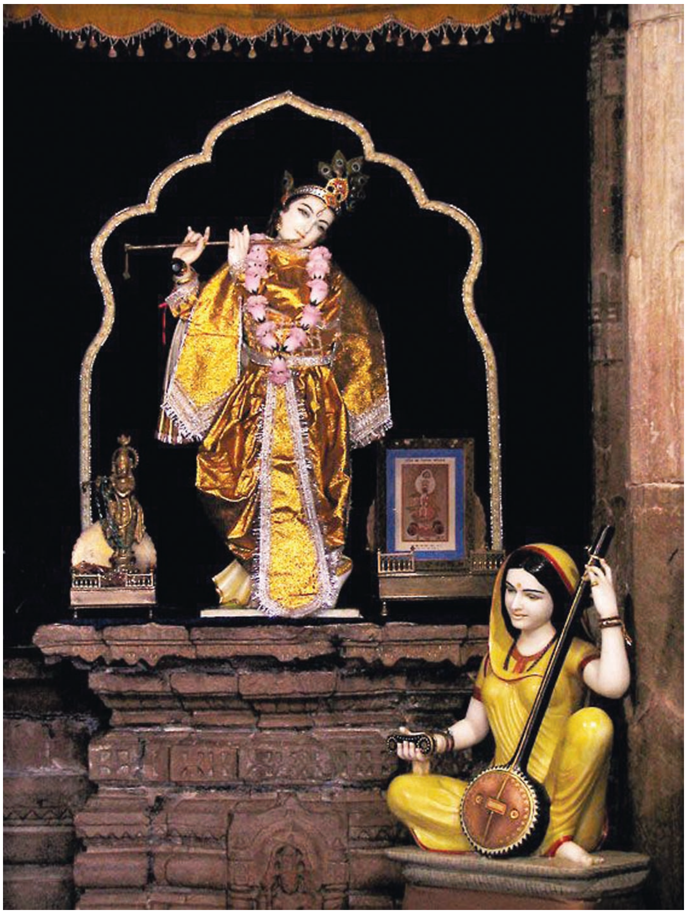

চিতোরগড়ে মীরাবাঈ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও মীরাবাঈয়ের বিগ্রহ।

সৃষ্টিশীল চেতনা। কৃষ্ণের কালোবরণ মূর্তি নিয়ে খেলতে খেলতে কল্পনা ও ভাবের মিশ্রণে সে তৈরি করে ফেলে তাঁর নিজের জগৎ। প্রেমময় যে জগতের অধীশ্বর শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ। আর রাধারূপে সে নিজে। সে জগতে সংসারের দুই অপার্থিব কুশীলব— মীরা ও তাঁর বধুয়াঁ।

একপ্রকার জোর করেই মেবারের রাজা ভোজ সিংহ শিশোদিয়ার সঙ্গে মীরাবাঈয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংসারের কাজে মন নেই ঘরনির। সমস্তদিন মানসপটে প্রেমিক কৃষ্ণের পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে, মনে মনে তাঁর চরণকমলের কাছে বসে থাকে। বিরহী হয়ে কবিতা লেখে। একতারা হাতে নিয়ে সুরারোপ করে। গান গায়। রাতবিরেতে বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মানস অভিসারে। স্বামী ভোজের প্রতি নিরাসক্ত মীরা যখন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী প্রায়, পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাসাদেই কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করালেন ভোজ রাজা। আপ্লুত মীরার অষ্টপ্রহর বসবাসের স্থান হলো ওই ঠাকুরঘর। যেখানে অধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রেমাবতার।

এক সময় যুদ্ধে নিহত হলেন ভোজরাজা। অকাল সাংসারিক বৈধব্যে বিদ্ধ হলেন মীরাবাঈ। স্বামীর সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগ ছিল না ঠিকই, তবু মীরার প্রতি শ্রদ্ধা বা দায়বদ্ধতায় একটুকুও কার্পণ্য ছিল না মেবার রাজের। স্বামী বিয়োগে বিচলিত মীরা গৃহত্যাগী হলেন। এখান থেকে শুভ্রবসনা মীরার সন্তজীবন শুরু। সন্তজীবন মানেই গাথা নির্ভর। মীরার সাধুসঙ্গ করার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। মুখে মুখে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক প্রেমগাথা। যত্ন করে সুর সাজিয়ে গড়ে তুলেছেন ভজনের আঙ্গিক।

‘অ্যায়সী লাগি লগন/মীরা হো গয়ী মগন/উয়ো তো গলি গলি হরি গুণ গানে লগি’— ভজনটিতে মীরার সন্তজীবনের দৈনন্দিন ধারাটির অনুরণন ঘটেছে। মরুময় রাজস্থানের আটপৌরে এক রাজপুত নন্দিনী এভাবেই নির্গুণ ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক ও নির্মল ভক্তি বিশ্বাসকে ভারতীয় ভাবধারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে। মীরার তনু-মন সর্বময় কৃষ্ণের শ্যামচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত। তাই তিনি বলেছেন, ‘হ্যায় আঁখ উয়ো যো শ্যাম দর্শন কিয়া ক্যারে।’ ‘বেকার উয়ো মুখ হ্যায় যো রহে ব্যর্থ বাতো মে’।

এদেশে ভক্তি আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় দক্ষিণ ভারতের মাটিতে। তারপর ক্রমশ তামিলনাড়ু আর কর্ণাটক থেকে বাঙ্গলা হয়ে তা বিস্তার লাভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভক্তি আন্দোলনের সাধক-সাধিকারা ছিলেন শিব ও কৃষ্ণের উপাসক। দক্ষিণে শৈব সাধকের সংখ্যা ছিল বেশি। আর পূর্ব ও উত্তর ভারতে ছিল বৈষ্ণব উপাসকের আধিক্য। সুরদাস থেকে তুলসীদাস, চৈতন্য থেকে মীরা, শ্রীকৃষ্ণের সাধকরা সবাই প্রেমরূপ অবতারের সাধন-ভজন করেছেন। তাঁদের কাছে কৃষ্ণ মানে ভগবান বিষ্ণুর বিভূতি। মানব শরীরে জন্ম নিয়েছিলেন মথুরায়।

সেই কৃষ্ণের প্রেমেই পাগলপারা মীরা। তাঁর গিরিধারী রক্তমাংসের চেতন শরীরে উপলব্ধ। কিশোরী বয়সে পৌঁছোনোর আগেই মথুরা- বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ‘প্রেমলীলা’ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন তিনি। সেই বয়সেই মীরার মধ্যে ‘মরমি কবির’ আবির্ভাব। ষোলো শতকে ভারতের পথেঘাটে দেখা যেত, এক পাগল সন্ন্যাসিনীকে। যার অবারিত কণ্ঠে শুধুই কৃষ্ণের নাম। গৃহত্যাগের পর পথে-পথে ঘুরে পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। রাজপুত রাজকুমারী তাঁর আত্মার শান্তি খুঁজে পেলেন বৃন্দাবনের পথে। ধূলিকণায়। কারণ এই বৃন্দাবনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর বংশীধারী পরমাত্মার ইহলৌকিক লীলার সন্দর্ভ। সকল যন্ত্রণা, সমালোচনার ঊর্ধ্বে মীরা কেবল তাঁর শ্যামকেই উজাড় করে দিয়েছেন অন্তরের ভক্তি ও ভালোবাসা। তিনি দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র প্রেমের মাধ্যমেই একজন সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর’— এই মিথ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন নিজের জীবন দিয়ে।

‘হরি মাহা দরদ দিবানোঁ/মাহারা দরদ না জানো কোই’— হরি আমি তোমার জন্য বেদনাতুর, অথচ আমার যন্ত্রণা বুঝলো না কেউ। এখানে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের চিরন্তন ব্যাকুলতাই প্রকাশ পায়। যে মীরাবাঈকে আধ্যাত্মিক ভারত মন্দিরের বিগ্রহ রূপে

রাজস্থানের চিতোরগড়ে মীরাবাঈ মন্দির।

পূজো করছে আজও তাঁর মানবীভাব প্রকাশ পায় ভজনের ছত্রে ছত্রে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পমাতা মনসা নিজেকে বাঙ্গলার আটপৌরে গৃহিণীর মতো উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর কথায় 'জনমদুঃখিনী আমি, দুঃখেই গেল কাল/যেই ডাল ধরি আমি, ভাঙে সেই ডাল।' অথচ মীরাবাঈ চিরাচরিত ঘরসংসারের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে, কৃষ্ণভজন করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেই পনেরোশো শতকে। প্রেমই তাঁর একমাত্র পাথেয়। কবিতায়, গানে, আরাধনায় নিজের জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছেন রাজপুত কূলবধূ। অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণপ্রেম রসে মগ্ন অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে 'কৃষ্ণফেরি' করছেন। তখনকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ ছিল বিপ্লবের নামান্তর। 'তবু যার কৃষ্ণ সহায়/তারে কে কখন ডরাই?'

মীরাবাঈ যখন একের পর এক ভজন লিখছেন, ষোলো শতকের ভারত তখন রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল। রাজপুতদের পরাজিত করে, ধীরে ধীরে ভারত দখল করছে মুঘল শাসকরা। চারদিকে চলছে রক্তক্ষয়ী হিংসা। আরেকদিকে একদল মানুষ ডুবে আছে ভক্তির অতলান্ত সাগরে। রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে মীরা মন্দিরে মন্দিরে, পথে ঘাটে হেঁটে, ভালোবাসা আর ভক্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন মানুষের অন্তরে। ব্যক্তিগত আনন্দ-ব্যথা, ঈশ্বরোপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর জীবন শুধু ত্যাগের। পরিবর্তে রাধার মতো বিরহী জীবনকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন আজীবন। মানসপটে প্রহরজুড়ে কৃষ্ণের অস্তিত্ব সাজিয়েছেন মীরা। কবিতা, গানে সাজিয়েছেন পূজার নৈবেদ্য। দেশ, সারং, ভৈরবী রাগে করেছেন আরতি। প্রায় সত্তরটি রাগে সুরারোপিত হয়েছে মীরার ভজনগুলি।

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা না কোঈ,
যাকে শির মোর মুকুট, মেরে পতি সোঈ।

গিরিধারী গোপালকেই নিজের জীবনে অদ্বিতীয় পুরুষের স্থান দিয়েছিলেন মীরা। জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছিল দ্বারকায়। সাধনায় লীন, বাহ্য চেতনাহীন মীরা তখন আশ্রয় নিয়েছেন দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর শ্রীচরণে। আমরণ এই হবে তার ঠাঁই। এমনই একদিন, মন্দিরের দ্বার খোলা হলে দেখা যায়, মীরাবাঈ সেখানে নেই। অনেকের মতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হয়েছেন মীরা। স্থাবর জঙ্গমে কৃষ্ণ-মীরার প্রেমগাথা সেদিন থেকেই অমরত্ব লাভ করে।

আজ পাঁচ শতক পরেও সাধিকা মীরাবাঈকে নিয়ে জনমানসে কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর রচিত ভজনগুলো আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। মৃত্যুর পর চিতোরগড়ে নির্মাণ করা হয় মীরাবাঈয়ের মন্দির। সেখানে গিরিধারীর সঙ্গে পূজো পান শুভ্রবসনা সাধিকা মীরাবাঈ। বিশ্বজুড়ে আজও তাঁকে নিয়ে গবেষণা চলছে।

এলস্টোন এবং সুব্রহ্মণ্যম মীরা বাঈয়ের নির্বাচিত আধ্যাত্মিক কবিতাগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে দ্য হিন্দি ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। কবি রবার্ট ব্লাই মীরার কিছু কবিতা অনুবাদ করে 'মীরাবাঈ ভার্সনস' নামে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে জেন হির্শফিল্ডের সঙ্গে যৌথভাবে 'মিরাবাঈ একস্ট্যাটিক পোয়েসম' সম্পাদনা করেছেন রবার্ট ব্লাই। দেশি-বিদেশি বহু গবেষকদের লেখার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন রাজপুত সাধিকা।

সামাজিক প্রত্যাখ্যান ছিল মীরার জীবনে স্বাভাবিক। কারণ সময়টা ছিল নারী স্বাধীনতার প্রতিকূলে। তবু বেদনার ভাষা অব্যক্ত রেখে স্মিত হাসিতেই ভরিয়ে দিয়েছেন ভজনের অবয়ব। তাই বলেছেন,

'লোগ কহে মীরা ভই বাবরি ন্যাত কহৈ কুলনাশী রে।
বিষ কা পেয়ালা রাণাজী ভেজা পীবত মীরা হাসি রে। ■

বাঁশিটার একটাই দোষ বলে রাধা রাধা

অগ্নিদীপ্তা দে

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে।।
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরান হারাব।।
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।।
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে।।
তাহে সে মোহন বাঁশি রাধা রাধা বাজে।
পরান কেমন করে মনু লোক লাজে।।

মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস লিখছেন যমুনার পথে শ্রীরাধিকা তাঁর সখীকে বলছেন— সখী, একি রূপ আমি দেখলাম আজ। এ রূপ অনুভব করে চোখে যে জল আসে, সে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমি যে ভালো করে সেই রূপ দর্শন করতে পারলাম না সখী! এখন কী হবে? মনের আশ যে মিটলো না আমার সেই অনুরাগের স্পর্শে প্রাণ যায় যায় করে। এ আমার কী হলো সখী? শ্যামকে দেখে মন যে এমন উতলা হবে সে কী করে জানবো সখী? দিন নেই রাত নেই শুধু কালার মুখ মনে পড়ে। সংসার কাজে আমার মন নেই আর। চারিদিকে শুধু 'শ্যাম' নাম। সখী, মোহনের বাঁশি যে পাগল করল আমায়, বাঁশিতে সুর ওঠে— 'রাধা রাধা'। কেমন করে মুখ লুকাই, লজ্জায় যে মরে যাই আমি'।

শ্যামানুরাগিনী রাধা চিরন্তন প্রেমের প্রতীক। অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ এই তিনকালের শাশ্বত প্রেম। সেই প্রেম ধরা পড়েছে রাধার বিরহে। কৃষ্ণ অঙ্গে রাধা বিরাজমান আবার রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একাত্মায় বিলীন। তবুও বিরহ। বিরহের আগুনে দগ্ধ রাধার নয়ন, প্রতি মুহূর্তে খোঁজে শ্যামকে। আবার শ্যামের বাঁশির ওই একটাই দোষ, সে শুধু জানে রাধা-রাধা। বিরহ ছাড়া যে প্রেমের অনুভূতি সম্পূর্ণ হয় না।

কথায় আছে শ্রীকৃষ্ণ জগৎসংসারের সকল জীবকে তাঁর রস সাধনার সম্মোহনে মোহিত করেন আর সেই কৃষ্ণকে মোহিত করেছেন শ্রীরাধিকা। তাই জানতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণের আরাধিকা রাধা আসলে কে? তিনি কি ঘরে ঘরে পূজিত হওয়া রাধা-কৃষ্ণ যুগলবন্দির শ্রীরাধিকা নাকি সে সাধারণ নর-নারীর একজন, কামনা-বাসনা অতৃপ্তির গল্পগাথায় পূর্ণ এক মানবী?

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী, রাধা

হলেন— গোকুলনিবাসী বৃষভানু ও কীর্তিকার কন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দেবীভাগবতের মতে, রাধার সৃষ্টি ভগবান কৃষ্ণের শরীরের বামভাগ থেকে। সেই রাধাই দ্বাপর যুগে বৃষভানুর কন্যা রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। গোলকধামে যখন ভগবান বিষ্ণু মর্ত্যলোকে তাঁর লীলা বিচরণের জন্য আসবেন বলে স্থির করেন, রাধারানিকে তিনি সেকথা জানালে শ্রীমতী মর্ত্যে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন মর্ত্যে বহু মানবের ভিড়, তাঁর ইচ্ছে তিনি শুধুই শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করবেন। শ্যামসুন্দর শ্রীমতীকে আশ্বাস দেন, মর্ত্যলোকে তিনি সদাসর্বদা কৃষ্ণদর্শন করবেন। রাধারানি শর্ত প্রদান করেন, ধরাধামে তিনি চক্ষু উন্মিলীত করে প্রথম যাঁকে দেখবেন তিনি কৃষ্ণ। তাই ইতিহাস বলে শ্রীমতী রাধা মর্ত্যধামে প্রথমে চোখ বন্ধ করে ছিলেন, শ্যামসুন্দরের উপস্থিতিতেই তিনি প্রথম নয়ন মেলেছেন।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে নন্দগ্রাম থেকে কিছু দূরে বৃষভানু যমুনায় যান স্নানে। নদীর জলে পদ্মপাপড়ির ওপর এক শিশুকন্যাকে দেখতে পান। বৃষভানু আনন্দিত মনে সেই শিশুকন্যাকে ঘরে নিয়ে আসেন। স্ত্রী কীর্তিকা ও বৃষভানু সেই কন্যার নাম রাখেন রাধা। শীঘ্রই দম্পতি বুঝতে পারেন তাদের কন্যা রাধা তার চোখ খুলছে না। তাঁরা প্রার্থনা করতে থাকেন জগদীশ্বরের কাছে। রাধারানির যখন পাঁচ বছর বয়স, নারদমুনি আসেন তাদের ঘরে। তিনি কন্যা রাধার চোখ বন্ধ করে থাকার আসল কারণ জানতেন। তিনি বৃষভানুকে বলেন গোকুল রাজ্যের রাজা নন্দ ও স্ত্রী যশোদার ঘরে কৃষ্ণ জন্মেছে, তাঁদের শীঘ্রই আমন্ত্রণ জানানো হোক। আমন্ত্রণ পেয়ে নন্দ, যশোদা তাঁদের সন্তান বলরাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে বৃষভানুর ঘরে আসেন। যশোদা ও কীর্তিকা যখন আলাপচারিতায় মগ্ন, ছোট্ট কানাই মায়ের কোল থেকে নেমে বিছানায় শুয়ে থাকা রাধার চোখে আঙুল স্পর্শ করে। চকিতে রাধা তার নয়ন মেলে তাকায়। সেই প্রথম মর্ত্যলোক রাধারানি তার বহু আকাঙ্ক্ষিত কালাকে দর্শন করেন। সংস্কৃত শব্দ রাধার অন্যতম অর্থ হলো শক্তিদাত্রী, সৌভাগ্যদায়িনী। ইতিহাস বলছে রাধার বিবাহ হয়েছিল আয়ান ঘোষের সঙ্গে। কেউ কেউ তাকে শ্রীকৃষ্ণেরই ছায়ারূপ মনে করেন।

রাধাকৃষ্ণ হিন্দুধর্মে সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরের পুরুষ ও প্রকৃতি সত্তার যুগলরূপ। প্রাচীন গ্রন্থে ভগবানের এই রূপের আরাধনার অনেক উল্লেখ আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, স্বার্থহীন নিষ্কাম ভক্তিরসে পূর্ণ। সে প্রেমের অনুভূতি স্বয়ং ঈশ্বর প্রাপ্তির অনুভূতি। যা ধরাধামের ভক্তরা যুগ যুগ ধরে যুগলরূপে পূজা করে আসছে। কত গীতগাথা কাব্য রচনা হয়েছে শতকের পর শতক জুড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দ রচনা করলেন তখন থেকেই দিব্য কৃষ্ণ ও তার ভক্ত রাধার প্রেমগাথা, সারা ভারতবর্ষে পূজিত হতে থাকে। বৈষ্ণব দৃষ্টিকোণ থেকে রাধা হলেন দৈবী স্ত্রী শক্তি। তিনিই দিব্য শক্তিকে প্রতিবিম্বিত করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের সমস্ত রূপের উৎস হিসেবে মনে করা হয়। শ্রীরাধিকা তাঁর সহচরী— দৈবী শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে রাধা-কৃষ্ণের রূপে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় পাই যা ভক্তিরসের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রাপ্তি বোঝায়। জীব গোস্বামী তার 'প্রীতি-সন্দর্ভ'-এ ব্যক্ত করেছেন শ্রীরাধিকার ভক্তিভাব।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বড়ুচণ্ডীদাসের কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিবরণ আছে। তিনি লিখছেন রাধার কী হৈল অন্তরের ব্যথা। / বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা।।

কবি রামানন্দ রায় তার প্রসিদ্ধ 'সংবাদ'-এ চৈতন্য মহাপ্রভুকে রাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদিকে মণিপুরী বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের পূজা আলাদাভাবে করেন না। বরং রাধা-কৃষ্ণকে একত্রে আরাধনা করেন। আবার আমরা যদি বৃন্দাবনে দেখি, সেখানে রাধা বিনে কথা নাই, আর কৃষ্ণ বিনে রাধা নাই। শহরের স্থানীয় পরিচিত লোকজন একে অপরকে সম্বোধন করে 'রাধে রাধে' বলে।

মধ্যযুগের কবির কাব্যরস যেমন ভরে ছিল রাধাকৃষ্ণের রূপরসে তেমনি বর্তমানের সাহিত্যের জগৎও পরিপূর্ণতা লাভ করে সেই প্রেমরসে। আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁর লেখায় বার বার শ্রীরাধিকাকে এনেছেন। তাঁর লেখা একটি গান সে সময়ের সুরের ভুবনে ঝড় তোলা দুটি কণ্ঠে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রের গাওয়া—

রাধার অধরে জাগে হাসি
কহিছে ডেকে শ্যামেরও বাঁশি
এ লগন রাই ভুল না আ...
দোলে দোদুল দোলে ঝুল না।

কিংবা সেই গানটি যা বিংশ শতকে ঝড় তুলেছিল গীতিকার ঋতুপর্ণ ঘোষের লেখা ও সুরে—

সখী হাম মোহন অভিসারে যাউ।
বোলো হাম এতদ সুখ কাহা পাউ।।

অথবা যদি একদম বর্তমান সময়কে ফ্রেমে ধরা যায় আরেকটি গান আলোড়ন তুলেছে— রাধা বলছেন—

'ভ্রমর কইও তারে গিয়া,...
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে
আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
ভ্রমর কইও গিয়া...।।'

এখন ২০২২। দোলপূর্ণিমা আসন্ন। বঙ্গনারীর মনে রাধিকা ধরা দেয় প্রেমের সাধিকা হয়ে। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শ্যামসুন্দরের প্রেমরঙ্গে ভরা পিচকারির রং যখন শ্রীমতীর অঙ্গ ভেজায়, তখন বঙ্গনারীরা গেয়ে ওঠেন,

মেরো না মেরো শ্যাম রং পিচকারি।
প্রেম অনুরাগে রাঙা হলো রাধা পিয়ারি।।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবই হোক বা বৃন্দাবনের রং পঞ্চমী, প্রেমের গুলাল লাগুক সকল রাধার শরীরে মনে। রাধার ভালোবাসার অনুভূতিতে ভরে উঠুক বঙ্গনারীর হৃদয়। চির শাশ্বত প্রেম বাঁধা পড়ুক নর-নারীর সম্পর্কে। প্রকৃতির প্রেম একাকার হোক।

ফ ঃ ৪

আকাশে কালো মেঘ নয়নে কালাচাঁদ

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

'এ রং সে রং নয় গো গোসাঁই! এ হলো পাকা রং। আগে মনে লাগে তারপর মুখে।'

কথাগুলো যিনি বললেন নবদ্বীপ শহরে অনেকেই তাকে চেনেন। তাঁর নাম আনন্দী বোষ্টমী। নিতাই ঠাকুরের সাধনসঙ্গিনী। কিন্তু বোষ্টমীর সম্বোধন শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ! অগত্যা বলতেই হলো, 'আপনার কথাগুলো খুব সুন্দর। তবে একটা প্রশ্ন আছে। মাছ-মাংসে আসক্ত ব্যক্তিকে গোসাঁই বলার রীতি নেই বলেই জানি।

কথার জবাব দেবার আগে তিনি হাসলেন। সন্ন্যাসিনীর রূপের বিচার করা উচিত নয়। কিন্তু খোলাচুলের অন্ধকারে ফর্সা পানপাতা গড়নের মুখটিতে যে দিব্যভাব সদা বিরাজমান তা দেখতে না চাইলেও চোখে পড়েই যায়। হেসে তিনি বললেন, 'আপনি গোসাঁই নন? কী বলেন গো! গোসাঁই না হলে কেউ রাধাকৃষ্ণের দোল দেখতে নবদ্বীপে ছুটে আসে?'

সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে শুধু রাধাকৃষ্ণ নন, এখানকার মানুষের রংমেলান্তি দেখারও একটা টান আছে। দুই টানে অস্থির হয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে পড়েছি। এখানে এলে নিতাই ঠাকুর খুশি হন। এবারও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের চাতালে দেখা হওয়া মাত্র বললেন, অ মশাই! সত্যি এলেন তা হলে। আমি তো ভেবেছিলুম মশকরা করছেন বুঝি। আপনার গুণে তো ঘাড় নেই। তা, থাকবেন তো কদিন?'

থাকা না থাকা রাধাকৃষ্ণের হাতে। তাঁরা রাখলে থাকব, না রাখলে আর কী করা! তবে এই মুহূর্তে চিন্তা থাকা নিয়ে নয়, আকাশে জমে থাকা মেঘ নিয়ে। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, গৌড়ীয় মঠ, পোড়ামাতলা গঙ্গার ঘাট যেখানে গেছি সর্বত্র একটাই আলোচনা— কাল বৃষ্টি হবে না তো? কাল দোল। দোলের দিন সকালে বৃষ্টি মোটেই কাম্য নয়। চরকিপাক শেষ করে নিতাই ঠাকুরের আখড়ায় ফেরা মাত্র সমস্যার চমৎকার সমাধান করে দিলেন আনন্দী বোষ্টমী। তাঁর বয়েস বেশি নয়। নিতাই ঠাকুরের সাধনকুঞ্জে বেশিদিন আসেনওনি। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর মনের কাঁচা রং যে পাকা হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। আমার মেঘলা দিনের চিন্তার জবাবে তিনি সুন্দর হেসে বললেন, 'আকাশে কালো মেঘ নয়নে কালাচাঁদ। ভালো করে দেখেন গো গোসাঁই। ওই কালো মেঘেই তাঁকে পেয়ে যাবেন।' এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমরা পাপীতাপী মানুষ। কালো মেঘ দেখে কালোবরণকে উপলব্ধি করার মতো মন বা নজর কোনওটাই আমাদের নেই।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রকৃতি আমাদের নিরাশ করল না। রাত আটটার সময় রাধাকৃষ্ণের শয়ান-আরতি হয়। চাতালে অনেক ভক্ত। দূর থেকেই দেখছিলাম আরতি। সেই সময় মাথায় কয়েকফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখি মেঘেদের রাজ্যেও সাড়া পড়েছে। কালাচাঁদের মন রাখার জন্য কিনা জানি না, দেখলাম নবদ্বীপে আর তাদের মন নেই। ভাসতে ভাসতে তারা পাড়ি দিয়েছে অন্য কোথাও।

ভোর হলো। নবদ্বীপে ভোরবেলায় হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে নগর পরিক্রমার যে রীতি ছিল তা এখন অনেকটাই কমে গেছে। কিন্তু একে দোলযাত্রার ভোর তার ওপর মহাপ্রভুর জন্মতিথি, তাই আজ অনেকেই বেরিয়েছেন। ফাল্গুনের ভোরবেলার স্নিগ্ধ রূপটি স্নিগ্ধতর হয়ে উঠেছে শ্রীখোলের বোলে। বাজনার সঙ্গে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বহুশ্রুত সেই গানটি, 'প্রভাতের কালে শরীর আঙিনার মাঝে কার গৌর নাচিয়া বেড়ায় রে।' আখড়ার বাইরে বেরিয়ে যা চোখে পড়ল তাতে মন আরও ভালো হয়ে গেল। দেখলাম কয়েকটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে সংকীর্তনকারী দলটির সঙ্গে নেচে নেচে গান গাইছে। এরা কেউ বৈষ্ণব নয়। দূরদূরান্তেও হয়তো এদের সঙ্গে মহাপ্রভুর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা গানের টানে এবং সুরের গভীরে নিহিত ভাবের টানে জড়ো হয়েছে। ঈশ্বর তো ভাবই, বস্তু তার আধার। আত্মার কাছে পৌঁছতে হলে শরীরের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া চাই। এই বাচ্চারা তারই সন্ধান পেয়েছে বোধহয়।

আখড়ায় দোলযাত্রার উৎসব শুরু হয়ে গেল। শ্রীমতী বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন— কৃষ্ণ আসবেন তাঁকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দিতে। সুচারু ভঙ্গিতে সম্পন্ন হলো অপেক্ষার পর্বটি। কৃষ্ণ এলেন নিতাই ঠাকুরের কোলে চেপে। তারপর আবিরে রাঙিয়ে দিলেন

শ্রীমতীকে। শ্রীমতী আছেন আনন্দী বোষ্টমীর মাথায়। আনন্দী রসে টইটম্বুর গলায় বলছেন, দাও তো মা, যার রং তাকে সব ফিরিয়ে দাও। যত খালি হবে তত ভরে যাবে তোমার মন— তোমার আত্মা।' কথা যেই শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে চাতালে অপেক্ষমান ভক্তরা ধ্বনি দিলেন, 'জয় রাধাকৃষ্ণের জয়।' রাধাকৃষ্ণের রংখেলা শেষ হতেই শুরু হলো ভক্তদের রংখেলা। আজ সবার হাতেই আবির, সবার হাতেই রং। চারিদিকে বেশ একটা হইচই। আনন্দী আমার কপালে আবির দিয়ে বললেন, 'আপনার মনের রং অক্ষয় হোক।' আবির আমিও দিলাম। কিন্তু কী প্রার্থনা করি! মাথা-টাথা অনেক ঘামিয়ে শেষে বললাম, 'আপনি এইভাবে সবার মনের রং অক্ষয় করে দিন। যাতে জীবনের রং কোথাও কম না পড়ে।'

খেলার পর পুজো। রাধাকৃষ্ণ রঙিন হয়ে দোলমঞ্চে গিয়ে বসেছেন। চারিদিকে রাশি রাশি থলকমল ফুটে রয়েছে। আর আছে অতসীলতা ও শিউলিগাছ। এবং একটু দূরে এক তমালতরু। পাশ দিয়ে যমুনা বয়ে গেলেই যোলো কলা পূর্ণ হতো। নিতাই ঠাকুর ভাগবত থেকে পাঠ করছিলেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শুনলে মনে হয় সময় বুঝি সামনে না এগিয়ে হঠাৎ অনেকটা পিছনে চলে গেছে। সে যাক। সময় যদি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে কিংবা পুরনোকে ফিরিয়ে আনতে পারে চিরন্তনের আঙ্গিকে— তাহলে সে এগিয়ে গেল নাকি পিছিয়ে পড়ল ভাবার কোনও অর্থই হয় না। নিতাই ঠাকুরের পাঠ থেকে রাধাকৃষ্ণের জীবনের অনেক কথা নতুন করে জানা গেল। দেশের বেশিরভাগ মানুষ রাধাকৃষ্ণকে দেবতা ভাবেন। কিন্তু সত্যিই কি তাঁরা দেবতা? না কি মানুষ? দেবতাদের প্রেমে কি বিচ্ছেদ আসে? তাঁরা চাইলেই তো আঙুলের ইশারায় সব বাধা দূর করে মিলিত হতে পারেন। তাহলে হন না কেন? কেন শ্রীমতীকে কুঞ্জে বসে চেয়ে থাকতে হয় জলভরা কালো মেঘের দিকে? কেনই-বা কল্পনা করতে হয় ওই জলভরা মেঘের আড়ালেই আছেন কৃষ্ণ। কালোয় কালোয় মিলে গেছে বলে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। শ্রীমতী মনে মনে মেঘ সরিয়ে খুঁজতে থাকেন প্রিয়তমাকে। অপেক্ষা করেন বংশীধ্বনির জন্য। এই বুঝি আহীরভৈরবীতে বেজে উঠবে মুরলী। গোঠে গোঠে চঞ্চল হবে গাভী। পালানে বইবে দুধের ধারা। বাঁশি শুনে উতলা হবে দখিন হাওয়া। এখনই বুঝি উন্মনা হবে যমুনার নীল জল। শ্রীমতী ঘর-বার করেন। আর তিনি, নওলকিশোর, দূরে বঙ্কিমঠামে দাঁড়িয়ে এসব দেখে মুখ টিপে হাসেন। কিশোর প্রেমিকের এই দুষ্টুমি কি দেবতার সাজে? কিংবা রাধারানির অতি বিখ্যাত মনের উচাটন ভাব? এসব মানুষের অভিব্যক্তি। মানুষের ভাব। নিতাই ঠাকুরের বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের মানবিক মুখটি নতুন করে ফুটে উঠল।

সত্যি কথা বলতে কী, মানুষ দেখার জন্য আসা। যাদের দেবতা বলে পাশে সরিয়ে রেখেছে সময়, তাদের মধ্যে যদি মানুষকে পাই তা হলে তীর্থযাত্রার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। রাধাকৃষ্ণের পর মহাপ্রভুকেও রং দেওয়া হলো। মহাপ্রভুকে দেবতা বানালেও তাঁর মানবজন্ম এখনও পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। হয়তো আরও একশো বছর পর তাও সম্ভব হবে।

দিনটা সত্যিই চমৎকার কাটল। নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় রঙের প্লাবন দেখলাম। গঙ্গায় স্নান করার সময় এক হিন্দিভাষী সাধু হঠাৎ মাথায় হাত রেখে বললেন, 'অ্যায়সে হি আতে রহনা বেটা। জিন্দেগী তুমেহ্ রং দিখলানা শুরু কি হ্যায়। তুমেহ্ বহোত কুছ দেখনা হ্যায়।'

ফেরার সময় হয়ে গেল। আনন্দী বোষ্টমী আর নিতাই ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু মন পড়ে রইল নবদ্বীপে। বিশেষ করে বোষ্টমীর একটি কথায়, 'এ রং সে রং নয় গো গোসাঁই। এ হলো পাকা রং। আগে মনে লাগে তারপর মুখে।'

আবার কবে পাকা রঙে ফিরতে পারব কে জানে! ■

শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান-২০২২

হাওয়া, জল ও ধরিত্রীমাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই সত্যিকারের ঈশ্বরের পূজা। নদীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা পরমেশ্বর প্রাপ্তির পথ। বাতাস গুরুস্থানীয়, জল পিতাস্বরূপ এবং এই পৃথিবী মাতাস্বরূপ। পরিবেশ ও জলের প্রতি আমাদের সচেতনতাই সমাজকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করবে।' গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার প্রসিদ্ধ সামাজিক ও সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে ৩৬তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন পদ্মশ্রী সন্ত বলবীর সিংহ সীচেওয়াল। তাঁকেই এবছরের সেবা সম্মান প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রী সীচেওয়াল একজন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ তথা নদী সংরক্ষণবাদী সমাজসেবী। সম্মানস্বরূপ তাঁর হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক ও মানপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। সেই চেক তিনি 'এক ওঙ্কার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, সীচেওয়াল'-কে সমর্পন করেন। সম্মান প্রদানের পর কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সম্মান আমাকে নয়, বরং সেবাকাজে সমর্পিত প্রাণ সমস্ত সেবাভাবী ব্যক্তির প্রতি এই সম্মান, যাঁরা বায়ু, জল ও পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করার জন্য কাজ করে চলেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পাতিয়ালার প্রখ্যাত আইনজীবী বলবীর সিংহ বিলিঙ্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট যুবা গায়ক হিমাংশু সোনী একক গীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. তারা দুগড়। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন কুমারসভার সম্পাদক মহাবীর বজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন. উপাধ্যক্ষ ভাগীরথ চাণ্ডক। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

গুজরাটে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহা সঙ্ঘের কার্যকারিণী বৈঠক

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কার্যকারিণী বৈঠক গত ২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের বড়োদরায় অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক এবং অধ্যাপক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক অনুপম বেরা বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে গত বছরের কার্যবিবরণী পাশ,

রাজ্যগুলির প্রতিবেদন পেশ, আগামী জুন মাস পর্যন্ত কাজের যোজনা, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান-সহ অনেক বিষয় আলোচিত হয়। পরবর্তী অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর বৈঠক আগামী ২৬-২৭ জুন উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়। সংগঠনের রাষ্ট্রীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১-১৩ নভেম্বর।

গিয়ে মহাভারত অবধি পরিক্রমা করে বিভিন্ন মতের সন্ধান মেলে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে যে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'রাজন্ ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন সকল মানুষকে অভয়দান করা উচিত।' আবার মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন যে, 'রাজা রঘুর আমল থেকে 'হোলি' শুরু। রাজা রঘু ইক্ষ্বাকু বংশের প্রাচীন রাজা ছিলেন। আবার পুরাণের দিক দিয়ে আলোচনা করলে— দু' হাজার বছর আগে রাজা ইন্দ্রদুম্ন গোকুলে হোলি খেলার প্রচলন করেন। এই ইন্দ্রদুম্ন কে ছিলেন তার সঠিক পরিচয় জানা যায়নি।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শ্রীকৃষ্ণ হোলিকাকে সংহার করে যে মারণ যজ্ঞের উৎসব করেছিলেন, সেটাই 'হোলি' নামে খ্যাত। দোলযাত্রা হিন্দু বৈষ্ণব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে আবির ও রং নিয়ে খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকে এই খেলার উৎপত্তি। রাধা ও কৃষ্ণের লীলা থেকেই শুরু তাই এইদিন মন্দিরে ও বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণের পূজা হয়। বঙ্গের নবদ্বীপ ও শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও বাল্যজীবন কেটেছে মথুরা ও বৃন্দাবনে। তাই এই দুই স্থানে হোলি খেলা বিখ্যাত। দূরদূরান্ত থেকে জনসমাগম হয় হোলির উৎসব উপভোগ করার জন্য। শীতের শেষে বসন্তকালে এই উৎসব হয় বলে অনেকে বসন্তোৎসব বলে। এই উৎসব শীতের বিদায় ও বসন্তের আগমন বার্তা বহন করে।

ভবভূতির 'মালতি মাধব' নাটকে বসন্ত উৎসবের কথা উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের লেখা 'রত্নাবলী' নাটকে হোলি খেলার কথা লিপিবদ্ধ আছে। আবার কবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে বসন্ত বর্ণনায় হোলি খেলার কথা জানা যায়। এমনকী ফারসি পর্যটক অলবেরুনি ভারতবর্ষে হোলি উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু হিন্দুরা নয় মুসলমানরাও হোলি খেলতেন। এমনকী প্রাচীন বিজয় নগরের রাজধানী হাম্পিতে হোলি খেলা হতো। সেখানে এক মন্দিরের গায়ে হোলি খেলার দৃশ্য খোদাই করা আছে।

পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রে সংগঠিত হয় বহ্ন্যুৎসব যার চলতি নাম 'চাঁচর'। এই চাঁচর কথাটি সংস্কৃত চর্চিত শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর চাঁচর শব্দের অর্থ হলো উৎসবের হর্ষধ্বনী। তাই চাঁচর পোড়ানোকে মেড়াপোড়া বা বুড়ির ঘর পোড়াও বলা হয়। ওড়িশাতে এই চাঁচর পোড়ানোর নাম 'মেনটা পোড়েই' বা 'মেট্রাসুর' বধ বলা হয়। এই উৎসবের পূর্ণিমার চাঁদনি রাত ছিল বছরের শেষ দিন। এই দিনটিতে নেওয়া হতো ন্যায় ও সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার

প্রিয়জনের ফাগে মন রাঙানোর দিন

প্রশান্ত কুমার মণ্ডল

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করো না বিড়ম্বিত তারে।।' যন্ত্রের মূর্ছনায় ক্লান্ত মনকে যেমন প্রাণবন্ত করে তোলে, ঠিক তেমনি রঙের ছোঁয়ায় যেন বেজে ওঠে বসন্তের রাগিণী। দখিনা বাতাসে মৃদু-মন্দ ছন্দে ভেসে আসে ফাগের সুবাস। নানান রঙের অপরূপস্পর্শে প্রিয়জনকে রাঙিয়ে তোলার যে প্রয়াস তারই অনন্য একটি উৎসব হোলি। এই হোলি উৎসব হলো বিশ্বের বৃহত্তম রঙের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিশেষ ভাবে এটি 'হোলি' নামে পরিচিত। এই উৎসবের অপরনাম 'বসন্তোৎসব'। এই বসন্তের লগনে নানান রঙের ফাগ নিয়ে প্রাণচঞ্চল মানুষটির জন্য তার দোরে অপেক্ষা। আমরা তাকে রাঙিয়ে তুলি বাসন্তিক রাগে বা অনুরাগে, তার মন রঞ্জিত হয় প্রিয়জনের রাঙানো ফাগে।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিকে দোল পূর্ণিমা বলা হয়। হোলি হলো সম্মিলন, বন্ধুত্ব ও একাত্মতার উৎসব। এই সময় কোনোরূপ দ্বেষ না রেখে সবার সঙ্গে প্রেম ভ্রাতৃত্বের ব্যবহার করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই উৎসব। পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব কেটেছে, এখানেই ভারতের সর্ববৃহৎ হোলি উৎসব পালিত হয়।

এই দোল উৎসব কবে থেকে শুরু হয়েছিল এর জবাব পেতে

শপথ। আবার শালিবাহন ক্যালেন্ডার অনুসারে এই দোল উৎসবকে বছরের শেষ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। পুরাণ মতে বিগত বছরের সমস্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে নববর্ষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাই এই উৎসবকে আবার বর্ষবরণের উৎসব হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবের ধর্মীয় ছোঁয়া বর্জন করে যদি অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় উৎসবগুলির মধ্যে সামাজিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কিছু দিক আছে, তার মধ্যে হোলি বা দোল উৎসব কোনো ব্যতিক্রম নয়। দোলের যে ফাগ অর্থাৎ আবির তা চকুগুড়ি। তা শরীরে মথিত করলে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শুধুই রঙের খেলা কি হোলি? তা নয়— গোটা শীতকাল জুড়ে মানুষের দেহ-মনে যে আড়ষ্ঠতা, অবসন্নতা নেমে আসে তা হোলি খেলার মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে। হোলি খেলা বলতে শুধু রং খেলা বুঝি তা নয়, ব্রজভূমিতে আরও অনেক বৈচিত্র্যময় হোলি আছে যেমন— 'কিচর হোলি', 'লাড্ডু হোলি', 'ফুল হোলি', 'লাঠমার হোলি'।

শীতশেষে মাঠ শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে। গাছে গাছে জীর্ণ পাতা ঝরে গিয়ে নব পল্লবের সমাগম ঘটে। ডালে ডালে পুঞ্জিত হয় নব কিশলয়, তাতে প্রাণ চঞ্চলতার প্রকাশ ঘটে তার নবীনতার স্পর্শে। পলাশ গাছে ভরে উঠে নব যৌবনতার এক ভালোবাসা, যেন অনুরাগের ছোঁয়া ফাগ।

ঋতুগত দিক বিশ্লেষণ করলে শীতের পরেই বসন্তোৎসবই হলো এই দোল উৎসব। সারা ভারতবর্ষে এই উৎসব বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক বিভিন্ন ভাবে পালন করে থাকেন।

এই উৎসব ছুতমার্গ দূর করে। আনে জাতিগত একতা। একে অপরকে আবীর মাখিয়ে আপন করে নেয়। আরও নিকট হয় সম্পর্ক। হোলির বহুৎসব থেকে সংগৃহীত ছাই জল গুলে মাখা বা আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ বিভিন্ন স্থানে আছে। তাই বহু স্থানে হোলিকে হোরিও বলা হয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানায় এটাই দস্তুর।

মহারাষ্ট্রে শুধুই হোলি। গোয়াতে 'শিম্‌গা বা শিমগো' আর বঙ্গজীবনে হলো 'দোলযাত্রা'। ওড়িশাতে 'দ্যোলোৎসব'। দাক্ষিণাত্যে 'কামদহন' বা 'মদন দহন'। সবচেয়ে আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠান হয় রাজস্থানে। শান্ত ও সমাহিত দোলোৎসব পালন করা হয়ে থাকে পঞ্জাবে। যার নাম 'পবিত্র হোলি'।

পুরাণের এক কাহিনি জড়িয়ে আছে হোলিকা দহনের সঙ্গে— নারদ পুরাণে আছে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। অপর দিকে হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুবিরোধী, তাই তিনি নিজ পুত্রের বিষ্ণুভক্তি মানতে নারাজ। বহু চেষ্টা করেও যখন প্রহ্লাদকে বাগে আনতে পারলেন না তখন নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। তাই জল্লাদ কখনও তাকে পাহাড় থেকে, কখনও তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করল, আবার কখনও মত্ত হাতির পায়ের সামনে ফেলে দিয়ে, কখনো আবার বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু প্রতিবারেই অবাক ভাবে বেঁচে গেল প্রহ্লাদ। এরপর হিরণ্যকশিপুর বোন এল এগিয়ে। হোলিকা ব্রহ্মার কাছে তপস্যা করে বর পেয়েছিল, আগুনে তার কোনো ক্ষতি হবে না। তাই তৈরি হলো এক অগ্নিকুণ্ড। হোলিকা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করল, তাতে দেখা গেল এক আশ্চর্য ঘটনা, প্রহ্লাদকে আগুন স্পর্শ করতে পারল না। ব্রহ্মা বরদান করেছিলেন যে-নারী ও শিশুদের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে হোলিকার বর শক্তি হারাবে। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে দহন করার প্ররোচনায় তাকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করল। বিষ্ণুর বলে রক্ষা পেল ভক্তপ্রহ্লাদ আর হোলিকা ভস্ম হয়ে গেল। এই ঘটনা স্মরণ করে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রকাশ মনে করে শুকনো ডালপালা, কাঠ, খড় ও বিভিন্ন আবর্জনা পুড়িয়ে দেওয়াকে বলা হয় 'হোলিকা দহন'।

এই তিথিতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই এই পূর্ণিমাকে 'গৌরপূর্ণিমা' বলে। সেই কারণে এদিন খোল করতাল-সহ হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।

হোলির অন্য অর্থ হলো ত্যাগ। শুধুমাত্র জঞ্জাল পোড়ানোই নয়। নিজ মনের অহংকার, গর্ব, আমিত্ব ইত্যাদি জ্ঞানাগ্নিতে উন্মেষের আগুনে আহুতি দেওয়া। হোলিকা দহন হলো সত্যকে আলোকের হৃদয়ে প্রোথিত করে শুদ্ধতার এক অপরূপ পদ্ধতি।

ক্ষিতি মোহন সেনের মতে, দোল বা বসন্ত পূর্ণিমা হলো প্রেমের আনন্দের উৎসব তিথি। আবার এমনটা মনে করা হয় যে, এই পর্ব হলো কামদহনের। ভগবান শংকর তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কামদেবকে ভস্ম করে দিয়েছিলেন— তখন থেকেই এই উৎসব পালন করার রীতি প্রচলিত আছে।

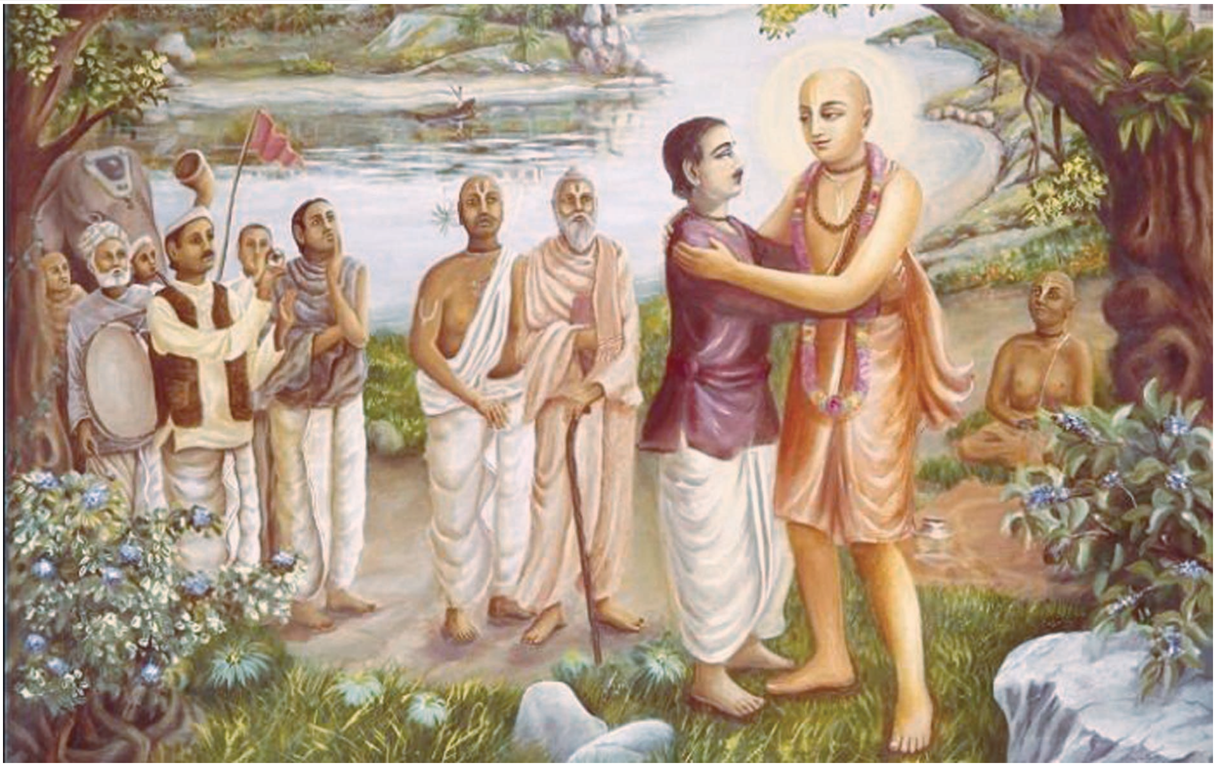

শচীমাতার আঙিনা থেকে মানুষের আঙিনায়

নিরোদ চন্দ্র শর্মা

বাঙ্গালির প্রাণের কবি সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিতায় হৃদয় মাধুর্য মন্থন করে কবির উক্তি— '' বাঙ্গালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'' নিমাইয়ের আবির্ভাব বঙ্গজীবনে এক অপূর্ব বিস্ময়। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়। মরমিয়া বৈষ্ণব সাধকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য— '' যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত/ কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম-রসসীমা, জগতে জানাত কে?'

গৌর এসে জানাল 'আপনি হয়ে হরি, মুখে বল হরি, হরি হরি বলে ডাক।' চৈতন্য কে? তার উত্তর দিচ্ছেন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী স্বয়ং— 'নন্দসূত বলি যারে ভাগবতে পাই/ সেই কৃষ্ণ অবতরি চৈতন্য গোঁসাই।''

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, 'চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান, জ্ঞানসূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিপ্রেম দুই-ই ছিল। চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার। জীবকে ভক্তি শেখাতেই তাঁর আগমন'।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তিথি দোলপূর্ণিমা। 'ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী। তারি মাঝে জন্ম নিল গৌর গুণমণি।' শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সমগ্র ভারতেই পরিলক্ষিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— '' যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁর বিষয়ে লোকে আদরপূর্বক চর্চা এবং তাঁর পূজা করে থাকে। জগতে যত বড়ো ভক্তির আচার্য এসেছেন শ্রীচৈতন্য তাঁদের অন্যতম।

চৈতন্য পরবর্তীকালে মানবতার যে প্রভাব সাহিত্য ও ভক্তিশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয় তার মূলেও চৈতন্যদেব। কবি চণ্ডীদাস তাঁর রচনায় লিখেছেন—'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরভজনে জাতপাতের বাধা মানতে নিষেধ করে গেছেন। বিধর্মী সুলতান হোসেন শাহের উচ্চ রাজকর্মচারী 'সাকর মল্লিক' সনাতন গোস্বামী যবন সংস্পর্শে নিজেকে অশুচি জ্ঞান করতেন। এজন্য মনের দুঃখে জগন্নাথদেবের রথচক্রতলে দেহপাত করে প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। পরম করুণাময় চৈতন্যদেব তাকে নিরস্ত করেন। বলেন, '' দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।'' আর কৃষ্ণভজনে জাতিকুলাদির কোনো বিচার নেই। 'নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য। সৎ কুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি কুলাদি বিচার' (শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

এই উদার মানবিকতার শিক্ষা দিয়ে শ্রীচৈতন্য যদি সেদিন সনাতনের

প্রাণ রক্ষা না করতেন, তাহলে আমরা বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বমান্য সনাতন গোস্বামীকে চিরতরে হারাতাম। তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হতো।

দোলপূর্ণিমা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শুভ আবির্ভাব তিথি। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র নবদ্বীপ ধাম, মায়াপুর, বিভিন্ন বৈষ্ণব অঙ্গন, আখড়া, ভারত-বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য জীবন্ত জাগ্রত বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হচ্ছেন — ‘ আজও সে লীলা করেন গোরা রায়, কোনো কোনো ভক্ত দেখিবারে পায়।’

‘কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার। খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল। গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্তনে। ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্বজনে।’ কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষ্ণনামের মহিমার জোয়ার এসেছে।

‘ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা’ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বাইবেল বলছে, দিস পুয়র বডি ইজ দ্য টেম্পল অব দ্য লিভিং গড। স্বামীজী বলেছেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’ চৈতন্যদেব বললেন— ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণা।’ চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি হরি ভজে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে যদি হরি ত্যাজে।’ জীবকেপ্রেম, মানে ভালোবাসা। কী ধরনের ভালোবাসা? মহাপ্রভু বলছেন– ‘আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।’ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিবাদী যুগান্তকারী লীলা করেছেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ব্যবধান ও জাতিগত পার্থক্য ছিল বিশাল। যবনরা ছিল হিন্দুদের অস্পৃশ্য। যবনরাও হিন্দু বৈরী। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আত্মনিবেদিত শুদ্ধভক্ত যবন হরিদাসের তিরোধানের পর শ্রীমহাপ্রভুর নির্দেশে নীলাচলে তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্ত এবং তাঁদের পরিবার পরিজন হরিদাসের মরদেহ মিছিল করে পুরীধামের স্বর্গদ্বার অঞ্চলে সমুদ্রতীরে এলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বহস্তে সেই শব সমুদ্রজলে স্নান করালেন—‘ আপন শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায়। তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বানাইল। চৌদিকে পিণ্ডায় তাহা আবরণ কৈল’ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ)।

এইভাবে ‘সচল জগন্নাথ’ শ্রীচৈতন্যদেব পবিত্র তীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে বা নীলাচলে একজন যবন ভক্তের শেষকৃত্য সম্পাদন করে স্বহস্তে তাঁর বালুসমাধি রচনা করলেন। জাতপাতের বিভেদ লুপ্তকারী সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন সেই বালুসমাধি এখনোও স্বর্গদ্বারে বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়, যে নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী জগতে কারও কাছে কিছু চাননি, তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রসাদ পসারিদের কাছে জীবনে মাত্র একবার তাঁর গৈরিক বস্ত্রাঞ্চল পেতে দাঁড়ালেন। অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন–- ‘‘হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে। প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে।।’’ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা)। হিন্দু প্রসাদ পসারিরা সেদিন মুসলমান ভক্তের তিরোভাব মহোৎসবে প্রসাদ দিতে কোনো দ্বিধা বা কার্পণ্য করেননি। সেই প্রসাদে ভক্ত হরিদাসের নির্বাণ মহোৎসব সুসম্পন্ন হলো। হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এর চেয়ে আর কোনো বড়ো মানবিক প্রতিবাদ মধ্যযুগে হতে পারে কি?

বহু লোকের ধারণায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অতিশয় গোঁড়া ও সংকীর্ণচিত্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এমনকী তিনি নাকি শিব-শক্তি উপাসনার বিদ্বেষী ছিলেন আর রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপ ও নাম ভিন্ন অন্য কোনো রূপ ও নামে শ্রদ্ধাভক্তি রাখতেন না। কিন্তু তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ পাঠ করলে এই ধারণার উলটো দিকটি পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন উদার ভাবাপন্ন ও অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আনকথা ও গ্রাম্যবুলি অর্থাৎ পরচর্চা ও পরনিন্দার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরের সর্বাধিক নামেই তাঁর রুচি ছিল। মহাপণ্ডিত হয়েও পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। তাঁর রচিত একটি শ্লোক এরকম ঃ ‘‘ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।’’ কবির ভাবানুবাদ হলো— ‘ তৃণ হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, দীন হতে দীনতর, সেই বৈষ্ণব জয়গৌরব , ভাবে না সে কভু বড়ো।’ (ত্রিরত্ন, কবিশেখর কালিদাস রায়)।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের অবদান স্মরণ করে লিখেছেন— ‘‘ একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন, সেই বৈষ্ণবের জাত নেই, কুল নেই, আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্‌বোধিত করেছেন— সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই, দেশ নেই।’’ ৯চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ২৯)। শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি রবিঠাকুরের এই গানটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে— ‘‘কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস, সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস।’’

অনেকে চৈতন্যদেবকে ভাবুক মনে করেন। কারণ তিনি সারা জীবন কৃষ্ণপ্রেমে অশ্রু ফেলেছেন, নেচেছেন, গেয়েছেন। কিন্তু আর একটি দিক তাঁরা দুর্লক্ষ্য করেছেন– ‘‘ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুংকার। সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ-নাশে যাঁহার হুংকারে।।’’ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সিংহপুরুষ। সিংহ রাশিতে তাঁর জন্ম। আকৃতি প্রকৃতিও সিংহের ন্যায়। আজানুলম্বিত বাহু, তাঁর গ্রীবা, বক্ষস্থল কটিদেশ একমাত্র বীরেন্দ্র কেশরীর সঙ্গে উপমার যোগ্য। তিনি যখন জয়ধ্বনি করতেন, তখন তাঁর সিংহরবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হতো। মনে হতো যেন গগন বিদীর্ণ হচ্ছে, আবার সিংহবিক্রমে যখন তিনি নাচতেন তখন পদভারে মেদিনী কম্পিত হতো। ‘তপ্ত হেমসম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর।’ তাঁর সিংহনাদে অতি পাষণ্ডের প্রাণেও ভীতির সঞ্চার হতো আর পতিত অধম জনের হৃদয়ে আশার আলোকবর্তিকা দেখা দিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিবাদী চেতনা ও মানবিকতাবোধের বিস্তার ঘটেছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কালজয়ী রচনা শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। নবদ্বীপের কাজি মৌলানা সিরাজুদ্দিনের হৃদয় পরিবর্তন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য ভাগবতের কবি যাঁকে কৃষ্ণলীলায় ব্যাস বলা হয়, তাঁর গ্রন্থে দেখি, অন্যায়কারী কাজিকে শাস্তি দিতে মহাপ্রভু সংকীর্তনের দলকে নির্দেশ দিচ্ছেন কাজিকে ধরে এনে হত্যা করতে— ‘‘ক্রোধে বোলে প্রভু ‘আরে কাজি বেটা কোথা। বটি আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা।।’’ (শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৩ অধ্যায়)। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ক্রোধ অনেক শান্ত, সংযত, বিচক্ষণ ও সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিবাদী সংকীর্তন দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অন্যায়কারী কাজিকে বুঝিয়ে তার অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছেন—‘‘ প্রভু কহে একদান মাগিয়ে তোমায়। সংকীর্তন বাদ জৈছে নহে নদীয়ায়।’’ কাজি তার অন্যায় বুঝে মহাপ্রভুর অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিলেন এবং বললেন, ‘‘ কাজী কহে ‘ মোর বংশ যত উপজিবে, তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে।।’’ মহাপ্রভুই যে সংকীর্তনের প্রথম উদ্‌গাতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘ ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার। কলিযুগে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন সার।। সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।।’’ শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—‘‘ কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন। এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্বসার। কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার।’’ ▯

হোরিখেলা

সন্দীপ চক্রবর্তী

সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারি বলে পাড়ায় বন্ধুদের কাছে আমার দারুণ সুনাম। উচ্চ মাধ্যমিকে চারটে সাবজেক্টে লেটার পেয়েছি, চেহারাটাও ভালো ছেলে টাইপ। তাই আমার ঢপগুলো পাড়ার লোকে চেটেপুটে খায়। আজ অবধি আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।

কিন্তু রাজার কেসটা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে এবার আমি পারব না। কেন মনে হচ্ছে জানি না। আমারই মনের ভেতর কে যেন বারবার বলছে, ভুল করো না সন্তু। সারাজীবন পস্তাবে।

যাই হোক, এবার আসল ঘটনাটা বলি। আমার ভালো নাম শান্তনু মিত্র। ইংলিশ অনার্স, সেকেন্ড ইয়ার। পড়াশোনার বাইরে আমার একমাত্র আকর্ষণ তরুণ সঙ্ঘের ক্লাবঘরে ক্যারাম পেটানো। অথবা পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া। আমাদের একটা গ্রুপ আছে। আমি, রাজা, মিতান, টুকাই, টুবলু আর রনি। সবসময় আমরা একসঙ্গে থাকি। পাঁচ মাথা একজায়গায় হলেই সময়টা দিব্যি হেসে খেলে কেটে যায়। কিন্তু ইদানীং একটা সমস্যা হয়েছে। যার জন্য আমরা সবাই চিন্তিত।

রাজার টেনশন সব থেকে বেশি। ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছে। ছিটিয়ালদের মতো আলটপকা পায়চারি করছে। এসব দেখে রনি বলল, চাপ নিস না রাজা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাজা বিমর্ষ মুখে বলল, তোরা তো জানিস মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আমি বিন্দাস থাকি। কিন্তু ওই মেয়েটাকে দেখার পর থেকে না পারছি খেতে না পারছি শুতে— একেবারে যা তা অবস্থা। আমার একমাত্র ভরসা সন্তু।

আমিও তো তাই বলছি। সন্তু যখন আছে কোনও চিন্তা নেই।

রাজা আমার হাত ধরে বলল, সন্তু তুই শুধু মেয়েটাকে দোলের দিন সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবের ফিস্টে এনে দে। বাকি যা করার আমি করব।

কী বলব বুঝতে পারলাম না। রাজা যে মেয়েটির কথা বলছে ওরা নির্মলকাকুর একতলার ভাড়াটে। মাত্র দু' মাস হলো এসেছে। ছোটো ফ্যামিলি। বাবা মা আর ওই মেয়েটা। নির্মলকাকুর বাড়ি আমাদের বাড়ির একদম লাগোয়া। এ বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে ও বাড়িতে যাওয়া যায়। মেয়েটা রোজ বিকেলে ছাদে ওঠে। আমার ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আমি দেখি। মেয়েটাও আমায় দেখে। ষোলো- সতেরো বছরের কোনও মেয়ের যদি কাউকে ভালো লাগে তা হলে সে সেই অনুভূতি গোপন করতে পারে না। আমি জানি আমাকে ওর ভালো লাগে। মিথ্যে বলব না আমারও ওকে ভালো লাগে। সেটা অবশ্য বড়ো কথা নয়। রাজা চায় আমি মেয়েটাকে গুলগাপ্পি দিয়ে ক্লাবের ফিস্টে নিয়ে যাই। ও ওখানেই প্রপোজ করবে। কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ নেই— নাম পর্যন্ত জানি না— তাকে কীভাবে রাজি করাব, আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

ফঃ৫

রাজা অধৈর্য হয়ে বলল, কী রে সন্তু! চুপ করে গেলি কেন?

না, মানে...

আমি প্রমিস করছি সন্তু। তুই যদি আমার কাজটা করে দিস তাহলে ফোর্ট র‍্যাডিসনে পার্টি করার সব খরচ আমি দেব।

টুবলু মুখে আঙুল দিয়ে কর্কশ ভঙ্গিতে সিটি দিল। টুকাই তো নাচতেই শুরু করল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওদের। হঠাৎ নিজেকে খুব ছোটো মনে হলো। রাজার বাবার প্রচুর টাকা। আমাদের গ্রুপের প্রতিটি ইভেন্ট রাজাই স্পনসর করে। কিন্তু ও কি আমাদের বন্ধু ভাবে? না কি ক্রীতদাস মনে করে?

সংবিৎ ফিরল রাজার ডাকে, সন্তু, অ্যাই সন্তু!

কষ্টটা জোর করে গিলে নিয়ে বললাম, আসলে আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই। তাই একটু টেনশন হচ্ছে।

টুকাই বলল, আরে বস তুই হচ্ছিস এই মিলেনিয়ামের সেরা ঢপবাজ। হাড় কিপটে শশাঙ্কজেঠাকে গুজরাট ফ্লাডের গল্প শুনিয়ে যে পাঁচশো টাকা চাঁদা বের করতে পারে তার পক্ষে একটা মেয়েকে পটানো কোনও ব্যাপারই নয়। আমি বলছি তোর দু'মিনিটও লাগবে না।

প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারলাম না। শশাঙ্কজেঠা পাড়ার লোক। আমাকে জন্মাতে দেখেছেন। দুর্গাপুজোর চাঁদা থেকে টাকা বাঁচিয়ে আমরা গুজরাটের ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে পাঠাব শুনে তিনি কনভিনসড হতেই পারেন। কিন্তু ওই মেয়েটা আমার মতো একজন অপরিচিত যুবকের কথায় ক্লাবের ফিস্টে যেতে রাজি হবে কেন?

বাড়ি ফিরলাম মাথায় পাহাড়ের মতো ভারী বোঝা নিয়ে। কাল দোল। মাঝখানে একটা মাত্র রাত। এর মধ্যে আমাকে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। সত্যি কথা বলার জন্য কোনও স্ট্র্যাটেজি লাগে না। মিথ্যের জন্য লাগে।

সারারাত ঘুম হলো না। সকালে বেরিয়ে রং কিনলাম। আর আবির। তারপর সোজা ছাদে। ঠিক স্ট্র্যাটেজি নয়। দুটো প্ল্যান করেছি। মেয়েটা ছাদে থাকলে প্ল্যান : ১। আর ছাদে না থাকলে প্ল্যান : ২। ছাদে গিয়ে যা দেখলাম তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। মেয়েটা কার্নিশে ঝুঁকে রাস্তায় রঙের প্লাবন দেখছে।

হঠাৎ আমার ভেতর থেকে সেই অচেনা কণ্ঠস্বর আবার আমাকে সাবধান করে দিল, ভুল করো না সন্তু। সারাজীবন পস্তাতে হবে।

ধুত্তোর! নিকুচি করেছে। পস্তালে পস্তাব। রাজা আমাকে বন্ধু ভাবে কি না জানি না। কিন্তু আমি ওকে বন্ধু ভাবি। আর ও মেয়েটাকে ভালোবাসে। সুতরাং যা হয় হোক, একটা চেষ্টা আমায় করতেই হবে।

হাই! আমার নাম শান্তনু মিত্র। ডাকনাম সন্তু। তুমি?

ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। ওর চোখে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। বরং খুশিতে টলটল করছে চোখদুটো। আশ্চর্য! এরকম তো হওয়ার কথা নয়। মেয়েটা কি আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল? হাওয়ায় বেসামাল ওড়না সামলে ও বলল, আমার নাম দোলনচাঁপা।

নাইস নেম! দোলনচাঁপা তো ফুলের নাম। আমি অবশ্য কখনও দেখিনি। একদিন নেটে দেখে নেব। বাই দা ওয়ে, তুমি দোল খেল না?

খুশি সরে গিয়ে দোলনচাঁপার চোখে কষ্ট ফুটল, আগে যেখানে ছিলাম সেখানে খেলতাম। এখানে তো আমার কোনও বন্ধু নেই।

এতক্ষণে একটা লুজ বল পেলাম। স্টেপ আউট করে চালালেই সিক্সার। হেসে বললাম, বন্ধু নেই মানে? আমি তোমার বন্ধু। এ পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে তোমার বন্ধু। জানো তো, আমাদের একটা বিশাল গ্রুপ আছে। আমি, রাজা, টুকাই, টুবলু, রনি, অহনা, টুম্পা, মিলি এটসেটরা এটসেটরা... সবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে বুঝতেই পারবে না। নাউ লেটস সেলিব্রেট আওয়ার নিউ ফ্রেন্ডশিপ। আমি যদি রং দিই তুমি কিছু মনে করবে না তো?

তা করব না। কিন্তু দেবে কীভাবে?

দ্যাখোই না—

ট্যাঙ্কের পিছন থেকে কাঠের পাটাতনটা বের করে চাপিয়ে দিলাম কার্নিশের ওপর। তারপর সেতু পেরিয়ে চলে গেলাম নির্মলকাকুর ছাদে। ঘটনাটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। দোলন রিঅ্যাক্ট করার সুযোগ পায়নি। কাছে গিয়ে দেখলাম ও ভয় মেশানো দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ওপর হাত চাপা। স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। বলল, এভাবে কেউ আসে! তিনতলার ছাদ। যদি পড়ে যেতে কী হতো বুঝতে পারছ?

মুহূর্তের জন্য সামান্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলাম। মা ছাড়া আর কাউকে আমাকে নিয়ে এরকম টেনশন করতে দেখিনি। মায়ের মুখেই শুনেছি, কেউ যখন কাউকে খুব ভালোবাসে তখনই তাকে নিয়ে একটা চাপা টেনশন তৈরি হয়। সবসময় মনে হয় কোনও বিপদ-আপদ হলো বুঝি! দোলনের রিঅ্যাকশন অনেকটা মায়ের মতো। একটা প্রশ্ন বিদ্যুতের মতো আমার মাথায় উঁকি দিয়ে গেল। ও কি আমায় ভালোবাসে? কিন্তু তা কী করে হয়! ও তো আমাকে ভালো করে চেনেই না।

নিজের ওপর রাগ হলো। এসব আমি কী ভাবছি! একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, টেক ইট ইজি দোলন। প্রত্যেক বছর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এই ছাদে ঘুড়ি পড়লে আমি এভাবেই আসি। আমার অভ্যেস আছে।

দোলনের আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

প্রমিস করো আর কখনও এভাবে আসবে না। আমাকে ডাকবে। আমি এসে দিয়ে যাব।

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার এসে কানে লাগল। রাজার গলা। রাজা দোলের দিন হোলি হ্যায় বলে গলা ফাটাচ্ছে। পেটে রঙিন জল পড়লে রাজা হিন্দি বলে। বুঝলাম সকাল দশটাতেই শুরু হয়ে গেছে। তবে একটা ভালো কাজ রাজা করেছে। দোলনের মনঃসংযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমাকে আর প্রমিস করতে হবে না। বললাম, এসো তোমাকে একটু রং দিই।

দোলন চোখ বন্ধ করল। হাতে রং নিয়ে আমি ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু দিতে পারলাম না। একটা জিজ্ঞাসা আমায় থামিয়ে দিল। আমার মতো একটা প্রায় অচেনা ছেলেকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার জোর দোলন কোথা থেকে পাচ্ছে? ও কি জানে না ছাদের দরজা বন্ধ? ও কি জানে না আমার পকেটে রুমাল আছে আর সেই রুমাল দিয়ে আমি ওর মুখ বেঁধে ফেলতে পারি? তারপর ও যত চিৎকারই করুক মাইক আর উন্মত্ত হোলি হ্যায়ের নীচে আজ সব চাপা পড়ে যাবে।

মায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল। মা বলে, বিশ্বাস আর নির্ভরতা ভালোবাসার দুটি স্তম্ভ। মেয়েরা যাকে বিশ্বাস করতে পারে না, যার ওপর নির্ভর করতে পারে না— তাকে ভালোবাসতেও পারে না। বুকের ভেতর তিরতিরে ঝরনার মতো একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। আমার আর রং দেওয়া হলো না। মনে হলো বাড়ির মেয়ে ছাদে গিয়ে রং মেখে এলে প্রশ্ন উঠবেই। নিষ্ঠুর সেইসব প্রশ্নের আঘাতে কুঁকড়ে যাবে দোলন। সেটা আমি হতে দিতে পারি না। আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় লাল আবিরের তিনটে সমান্তরাল রেখা টেনে দিলাম ওর কপালে। তারপর বললাম, সারাজীবন দোলের দিন তোমার কপালে এমনি করে আবির দিতে চাই দোলন। নেবে আমার রং?

বলেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। একথা আমার নয়। কিংবা, বড্ড বেশি করে আমার। কিন্তু আমি রাজার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।

দোলন চোখ খুলল। ওর দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক তন্ময়তা। যেন ও এই পৃথিবীতেই নেই। স্বপ্নের জগতে ভেসে রয়েছে। আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমার ভুল হয়েছে দোলন। আমি ও কথা বলতে চাইনি। কিন্তু ও শুনতে পেল না। বলল, সারাজীবন রং দেবার মানে বোঝো সন্তুদা?

আমি রাজার কথা বলতে চাইলাম। মিথ্যে কথা বলে ওকে ফিস্টে নিয়ে যাবার কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। ইচ্ছেই করল না। মনে হলো রাজা তো দোলনকে ভালোবাসেনি। শুধু টাকার জোরে দখল করতে চেয়েছে। তাই দোলনের আরও কাছে গিয়ে বললাম, বুঝি।

দোলন হাসল। তারপর আমার হাত থেকে আবির নিয়ে আমারই গালে লাগিয়ে বলল, তাহলে দিয়ো তোমার রং। আমি নেব। সারাজীবন ধরে নেব।

সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে যাওয়া মাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করল, কী রে! সকালে এলি না কেন?

সারা দুপুর শুয়ে শুয়ে স্ট্র্যাটেজি বানিয়েছি। এই ঢপ অনেকদিন কেউ বুঝতে পারবে না। যখন বুঝবে তখন অন্য কিছু বলা যাবে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, তোর কাজেই তো গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলি! বললি ওকে আমার কথা?

বলেছি। তবে হবে না। ওর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে। রাজা হতাশ হয়ে বসে পড়ল। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলাম। ◘

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

বাংলা গানের দুই অমর কথাশিল্পী

রুদ্র সেন

এক বসন্তের রাতে হোলির একটা অনুষ্ঠানের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ দেখছিলাম। এডিটিং রুমে আইম্যাকের সামনে বসে টাইটেল কার্ড বানাচ্ছে চন্দন। পাশের চেয়ারে বসে আমি প্রোগ্রামের একটা ভালো নাম ভাবছি। যুতসই নাম কিছুতেই মনে আসছিল না। এমন সময় গুনগুন করতে করতে মানসদা এলেন এডিট বে'তে। 'কুমকুম রাঙা ফাগে, আবিরেরও অনুরাগে, রাঙাবো তোমারই তনু ওগো বধূয়া'। গানটা শুনে ভালো লেগেছিল। আরও ভালো লেগেছিল গানের কথা। সেদিন ওই গানের কথা ধার করেই প্রোগ্রামের নাম দিয়েছিলাম 'পরানে লেগেছে ফাগুয়া'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া গানটির গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সেই প্রথম আমার তাঁর লেখা গানের সঙ্গে আলাপ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গান যত শুনেছি, তাঁর সৃজনী সত্তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আরও বেড়েছে। তার আগে অবশ্য 'আমি যামিনী, তুমি শশী হে', 'ও নদীরে...' অথবা 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে'-সহ অজস্র গান শুনেছি। কিন্তু গীতিকার প্রসঙ্গে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সেদিনের পর থেকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানগুলো বার বার শুনেছি। শব্দের প্রয়োগ, কথার বুনট ও ভাবের মূর্ছনা— সবদিক দিয়েই 'মাস্টার পিস'।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল মানসদার। সম্পর্ক ছিল মামা-ভাগ্নের। অকৃতদার গৌরীপ্রসন্ন তাঁকে স্নেহ করতেন খুব। সেই মানসদার মাধ্যমেই গৌরীপ্রসন্নকে কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

১৯২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর। অবিভক্ত বাঙ্গলায় পাবনার গোপালনগর গ্রামে জন্ম গৌরীপ্রসন্নের। বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থের লেখক তিনি। মা সুধা মজুমদার ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার প্রতি তাঁরও ছিল আগ্রহ। সেই অর্থে লেখালেখির হাতটা গৌরীপ্রসন্নের জন্মসূত্রেই পাওয়া।

গৌরীপ্রসন্ন তখন ইংরেজির ছাত্র। একটা গান লিখে শচীনকর্তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। সেই গানের কথা পছন্দ হয়েছিল শচীনকর্তার। আকাশবাণীতে সেই গান তিনি গেয়েওছিলেন। গৌরীপ্রসন্নের কাছে এটা ছিল স্বপ্নাতীত। ছেলেবেলায় গ্রামোফোনে শচীনকর্তার গান শুনে বড়ো হওয়া মজুমদার বাড়ির ছোটোছেলে বাচ্চুর। সেই শচীনদেব বর্মন তাঁরই লেখা গান রেডিয়োয় গাওয়ার পরে মনোবল বাড়লো। পরে 'মেঘ কালো আঁধার কালো', 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে', 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'— গৌরীপ্রসন্নের কথায় ও শচীন দেববর্মনের সুরে সৃষ্টি হয়েছিল এমন অসংখ্য কিংবদন্তী গান।

বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম স্রষ্টা গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সেই সময়ে ভারতের এমন একজনও বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না যিনি গৌরীপ্রসন্নের লেখা গান গাননি। শচীন দেববর্মন, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, রাহুল দেববর্মন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় এমন অনেক নাম। তাঁদের পাঁচটা সেরা গানের মধ্যে একটা গান অবধারিত গৌরীপ্রসন্নের। কালজয়ী 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' গানটি তাঁরই লেখা। নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গৌরপ্রসন্ন-হেমন্ত ছিলেন সার্থক জুটি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেরা গানগুলোর অধিকাংশই গৌরীপ্রসন্নের লেখা। 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে', 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী' 'তারে বলে দিও' (দুই ভাই), 'আজ দু'জনার দুটি পথ', 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' (লুকোচুরি), 'এই রাত তোমার আমার' (দীপ জ্বেলে যাই), 'পথের ক্লান্তি ভুলে' (মরুতীর্থ হিংলাজ) —এরকম অসংখ্য হিট গান তৈরি হয়েছে হেমন্ত-গৌরীর জুটিতে, যা বাংলা ছবির ইতিহাসে জুড়েছে নতুন অধ্যায়। ফ্লপ ছবিকেও শুধুমাত্র গানের জোরে সুপারহিট করে দিতে পারতেন এই জুটি। মান্না দে'র জন্য প্রথম বাংলা গান

লিখেছিলেন গৌরী। 'তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়' দিয়ে শুরু। তারপর বাংলা আধুনিক গানের জগতে মান্না দে'র মিউজিক এক্সপ্রেস ছুটেছিল ননস্টপ। 'যদি কাগজে লেখো নাম', 'আমি যামিনী' এবং আরেক কালজয়ী গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা'র মতো অগুনতি সুপারহিট গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। গানের ভাব অনুযায়ী শব্দ নিয়ে গবেষণা করতেন গৌরী। 'যদি হিমালয় আল্পসের সমস্ত জমাট বরফ একদিন গলেও যায়, তবুও তুমি আমার'-এর মতো বহু গান সেই সব এক্সপেরিমেন্টের সফল প্রয়োগ। শুধু তাই নয়, 'দেয়া নেয়া', 'সূর্যতোরণ', 'সূর্যতপা', 'শুধু একটি বছর' ছবির কাহিনিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন।

১৯৮৬ সালের মে মাসে অসুস্থ শরীর নিয়ে শ্যামল মিত্রের জন্য লিখেছিলেন 'এবারে যাওয়াই ভালো/তুমি থাকো, আমি যাই'। হয়তো গৌরীপ্রসন্ন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর চলে যাওয়ার সময় আসন্ন। তখন হাসপাতালে ভর্তি তিনি। হাসপাতালের বেডে শুয়েই লিখলেন 'যেতে দাও আমায় ডেকো না, কবে কী আমি বলেছি মনে রেখো না'। তাঁর মৃত্যুর পরে আশা ভোঁসলের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয় গানটি।

আধুনিক বাংলা গানের বহুমুখী গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার হলে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভার্সেটাইল। সংবেদনশীল, রোম্যান্টিক কবিও। বাংলা সিনেমার গানে সেরা রোমান্টিক গীতিকার ছিলেন দরাজ-দিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আবির্ভাবে বাংলা গানের স্রোত বাঁক নিয়েছিল এক নতুন প্রবাহে। ২ মে, ১৯৩৪-এ জন্ম হয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শৈশব কাটে হাওড়ায়। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। পারিবারিক সূত্রেই নাটক, সাহিত্য ও সংগীতকলায় আত্মিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন তিনি।

১৯৫৭ সালে এইচএমভি থেকে প্রকাশিত হয় তিন 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর এক যৌথ প্রয়াস— অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রথম রেকর্ড— 'তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা'। বাংলা নিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই রেডিয়োতে গীতিকারদের তালিকায় নাম উঠেছিল পুলকের। দোলের অনুষ্ঠানের জন্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' ছুঁয়ে দোলের সংগীতালেখ্য লিখেছিলেন পুলক। সুর দিয়েছিলেন অনুপম ঘটক।

বাংলা সংগীত জগতের ভাঁড়ার পূর্ণ হয়েছে মান্না-পুলক জুটির তৈরি অজস্র মণিমুক্তায়। 'আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে', 'তুমি অনেক যত্ন করে', জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই', 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে'র মতো বহু গান উপহার দিয়েছেন তাঁরা। মান্না দে পুলকের লেখা গান প্রথম প্লে-ব্যাক করেন ৬৫ সালে 'দিনান্তের আলো' ছবিতে। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত মান্নার নন-ফিল্মি বাংলা গানের সংখ্যা ২০১টি। যার মধ্যে পুলকের লেখা গানের সংখ্যা ১০৮।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত গানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক একটা চমকপ্রদ ঘটনা। যেমন ফ্লাইটে সুন্দরী এয়ার হোস্টেসকে দেখে প্লেনের উইন্ডো সিটে বসে ন্যাপকিনে লিখেছিলেন, 'ও চাঁদ, সামলে রাখো জোছনাকে।' হংস মিথুন ছবিতে হেমন্ত-সন্ধ্যার ডুয়েটে হোলির গান লিখেছিলেন পুলক। 'আজ কৃষ্ণচূড়ার আবির নিয়ে আকাশ খেলে হোলি'। গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

শেষ দিকে হয়তো বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল পুলকের। কোনও কিছুতেই যেন আর মন বসছিল না তাঁর! কোনও গানই যেন আর স্বর্ণযুগের গান হয়ে উঠেছিল না! মনে হচ্ছিল 'সবই যান্ত্রিক'! কেউ কেউ বলেন, মানুষটা হতাশা আর অবসাদে ভুগছিলেন। শেষের দিকের গানগুলো যেন কেমন কেমন ঠেকছিল তাঁর সহশিল্পীদেরও। 'যখন এমন হয়, জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা। ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দি...' তাঁর শেষ দিকের গানের কথায় হতাশা আর আত্মহননের উপলব্ধি ধরা পড়ে। এক ভোরে গঙ্গার স্রোতে ভেসে যায় রোমান্টিক গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্প্রাণ দেহ। কেন এমন আত্মবিধ্বংসের সিদ্ধান্ত সে খবর কেউ জানে না। শুধু নিশুত রাতের ঘূর্ণি হাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে গেছিল পুলকের কলম। সালকিয়া হাউসের ঝাড়লণ্ঠন, দেউড়ি-দালান, বাঁধাঘাট সেই রুদ্ধতার সাক্ষীমাত্র।

সমকালীন গীতিকারদের মধ্যে কোনো সমস্যা না থাকলেও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নের সম্পর্ক খানিকটা অম্ল-মধুর ছিল। আর সুযোগটা নিয়েছিলেন সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তিনি দু'জনকেই এক সময়ে ডাকতেন। কোনও গানের মুখরা লিখে ধরিয়ে দিতেন দু'জনকে। বলে দিতেন, যে ভালো লিখবে তাঁরটাই নেবেন। প্রতিযোগিতা শুরু হতো গৌরী-পুলকের। এই লড়াই থেকে সোনার ফসলই পেতেন নচিকেতা। এভাবেই অনেকটা কবির লড়াইয়ের ধাঁচে গৌরীর 'মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি', 'সূর্য ডোবার পালা যদি আসে' এবং পুলকের 'বেঁধোনা ফুল মালা ডোরে', 'এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনার' মতো গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

দিন বদলাচ্ছে। মানুষের জীবনশৈলীতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের স্বাদে এসেছে বদল। কিন্তু আটপৌরে আরও অনেক কিছুর মতোই গৌরী-পুলক থেকে গেছেন বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে। কেন না স্বর্ণযুগের এই দুই প্রবাদপ্রতিম গীতিকার আজও বাঙ্গালির কমফর্ট জোন। আহারে-বিহারে, আচার-অনুষ্ঠানে, কিংবা মাইক বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি— সবেতেই জুড়ে যান গীতিকার যুগল। সঙ্গে মান্না, লতা, আশা, কিশোর, রফি, এসডি, আরডি তো থাকেনই।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শাহরুখ-কাজল জুটি, তখনো প্রেমে চোট খাওয়া বাঙ্গালি যুবক-যুবতীর সহায় পুলকের 'আমি ফুল না হয়ে কাঁটা হয়েই বেশ ছিলাম' অথবা গৌরীপ্রসন্নের 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে' গানটি। তাঁদের কাছে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালির চিরায়ত আধুনিক কবিদের অন্যতম। □

রাণা প্রতাপ ও শক্তি সিংহ

১৫৭৬ সাল। শ্রাবণ মাস। মোগল ও রাণাপ্রতাপের সৈন্যরা মুখোমুখি হলো পাহাড় ঘেরা হলদিঘাটিতে। মাত্র বাইশ হাজার রাজপুত বীর এবং সামান্য কিছু ভীল নিয়ে অগণিত মোগল সৈন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলেন রাণাপ্রতাপ। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো সহায় সম্বল নেই। শুরু হলো মহা সংগ্রাম। বীর কেশরী প্রতাপ সিংহের অসাধারণ রণকৌশল দেখে রাজপুত বীরদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। তারা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো মোগল সৈন্যদের উপর। এই আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রতাপ সিংহ উন্মত্তের মতো রাজপুত-কলঙ্ক মান সিংহের খোঁজ করতে লাগলেন। মান সিংহকে না পেয়ে সেলিমকে আক্রমণ করলেন প্রতাপ। প্রতাপের প্রচণ্ড গতি রোধ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগল মোগল সৈন্য। কিন্তু কার সাধ্য তাঁর গতি রোধ করে।

সেলিমকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন প্রতাপ। সেলিমের হাতির হাওদায় গিয়ে লাগল বর্শা। লোহার হাওদায় লেগে বর্শা গিয়ে গেঁথে ফেলল মাহুতকে। প্রাণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল সেলিম। রাজপুত সৈন্যের হাতে অগণিত মোগল সৈন্য প্রাণ হারালো। কিন্তু আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মোগল সৈন্য ভরে ফেলল রণক্ষেত্র।

প্রতাপের মাথার উপর রাজছত্র ধরা ছিল। মোগল সৈন্যরা প্রতাপকে আক্রমণ করল। এবার প্রতাপের প্রাণসঙ্কট অবস্থা। তিনটি বর্শার আঘাত, তিনটি তরবারির ও একটি গুলির আঘাত লেগেছিল প্রতাপের শরীরে। তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আর দেরি না করে ঝালাপতি মান্না প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে প্রতাপের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। রাজার মাথা থেকে নিজের মাথায় তুলে নিলেন রাজছত্র। রাজছত্র দেখে মোগল সৈন্যরা ঝালাপতিকেই রাণাপ্রতাপ বলে ভুল করল।। রাণাকে ছেড়ে তার দিকে তেড়ে এল মোগল সৈন্য। অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে, অসংখ্য মোগল সৈন্য সংহার করে জীবন উৎসর্গ করলেন ঝালাপতি মান্না। প্রতাপের সৈন্যের চেয়ে মোগলের সেনাবল শতগুণে বেশি। প্রথমদিনের যুদ্ধ শেষ হলো। প্রতাপের বাইশ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র আটহাজার জীবিত রইল।

রণশ্রমে প্রতাপ ক্লান্ত। চৈতকের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে। একাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন প্রতাপ। প্রভুকে পিঠে নিয়ে তখনও চৈতক ছুটে চলেছে গিরিদুর্গের দিকে। এই সময় প্রতাপকে লক্ষ্য করছিল একটি মুলতানি ও একটি খোরাসানি সিপাহি। এই দুই মোগল সিপাহি প্রতাপের পিছু ধাওয়া করতে লাগল। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এক খরস্রোতা নদী। চৈতক এক লাফেই সে নদী পার হয়ে গেল। সুস্থ থাকলে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারত সে। কিন্তু তার শরীরে আর শক্তি ছিল না। আগের মতো আর দ্রুতগতিতে যেতে পারল না চৈতক। এই সময় মোগল সিপাহি দুটিও কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রতাপের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় ঘটল একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

প্রতাপের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর ভাই শক্তি সিংহ যোগ দিয়েছিল আকবরের পক্ষে। পণ করেছিল প্রতাপকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য দাদার তেজ ও বীরত্ব দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন দেখল মারাত্মকভাবে জখম দাদা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে আর দুজন মোগল সেনা প্রতাপকে হত্যার জন্য পিছু নিয়েছে, তখন সে স্থির থাকতে পারল না। দাদার প্রাণ বিপন্ন দেখে শক্তি সিংহের মনে এক পরিবর্তন এল, যে করেই হোক দাদাকে বাঁচাতে হবে। তৎক্ষণাৎ সে ঘোড়ায় চড়ে দুই মোগল সেনার পিছু নিল। তারপর হুংকার দিয়ে উঠল, 'হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার, খাড়া হো।' শক্তি সিংহ তরবারির কোপে দুই মোগল সেনাকে ধরাশায়ী করল।

চমকে উঠলেন প্রতাপ। পিছন ফিরে চাইতেই দেখলেন একজন অশ্বারোহী। তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। চিনতে পারলেন প্রতাপ। তাঁরই বিশ্বাসঘাতক ভাই, শক্তি সিংহ। বিস্ময় ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শক্তি সিংহ লজ্জায় মাথা নীচু করে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন প্রতাপ। দাদার পা দুটো জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদেতে নিজের অন্যায়ের জন্য বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল শক্তি সিংহ। বহুদিন পরে দুই ভাইয়ের মিলন হলো। আনন্দে ভরে উঠল প্রতাপের মন। ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। কিন্তু পরম আনন্দের মুহূর্তে প্রতাপের প্রাণাধিক প্রিয় চৈতক মারা গেল। চৈতকের অসাধারণ দক্ষতার জন্যই মোগল ব্যূহ ভেদ করে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রতাপ। চৈতক আর নেই, ভাবতেও বুক ফেটে যায় প্রতাপের।

(শাশ্বত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

প্রদ্যোত ভট্টাচার্য

বিপ্লবী প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার গোকুলনগরে। পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ সরকারের পীড়ন নীতির প্রতিকারকল্পে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মেদিনীপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে হত্যার জন্য যে দুজন যুবক আক্রমণ করেন, প্রদ্যোত তাঁদের একজন। এই আক্রমণের ফলে ডগলাসের মৃত্যু ঘটে। ঘটনাস্থলের কাছে প্রদ্যোত রিভলভার সহ ধরা পড়েন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রদ্যোতের গুলিতে ডগলাস নিহত হননি। বহু অত্যাচারেও প্রদ্যোত সঙ্গীর নাম প্রকাশ করেননি। বিচারে ১৯৩৩ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কী?

- কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির জনপ্রিয় লোকসংগীত হলো ভাওয়াইয়া।
- পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিংকে পাহাড়ের রানি বলা হয়।
- পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে উঁচু রেলস্টেশনের নাম ঘুম।
- এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাবার ট্রেনের নাম ট্রয়ট্রেন।
- ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দার্জিলিঙের সিদ্রাপং।
- জলদাপাড়া ও বক্সা জাতীয় অভয়ারণ্য আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত।

ভালো কথা

মাছ বন্ধু

দাদুকে একদিন বললাম, দাদু, তুমি মাছ খাও না কেন? দাদু বলল, বন্ধুকে কেউ কি খায় ? মাছেরা যে আমার বন্ধু। আমি অবাক হয়ে বললাম, মাছ আবার বন্ধু হয় নাকি? দাদু বলল, আলবাত। এবার পুজোর ছুটিতে যখন আমাদের বাড়ি আসবে তখন দেখাবো। দেখতে দেখতে পুজোর ছুটি এসে গেল। মায়ের সঙ্গে আমি ও দিদি মামার বাড়ি গেলাম। মামাদের একটি বিশাল পুকুর আছে। দাদু বলল কাল সকালে আমার সঙ্গে যাবে। পরদিন সকালে দাদুর সঙ্গে সেই পুকুরে গেলাম। দাদু বাঁধানো ঘাট দিয়ে জলে নেমে পড়লো। দেখলাম বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটা রুই-কাতলা দাদুর কাছে ভেসে উঠল। দাদু ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। দাদু আমাকেও ডাকল। আমি জলে নেমে পড়লাম,একেবারে দাদুর কাছে। দাদু ইশারা করতেই মাছগুলি আমার একেবারে কাছে চলে এল। একটুকুও ভয় করছে না। আমি ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও মাছ খাবো না।

দেবদত্ত বসু, দশমশ্রেণী, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বাঘার দাগা

প্রীতম সেন, একাদশ শ্রেণী, ঝালদা, নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

পেয়েছিলাম ছানাটিকে
বড়ো রাস্তার পাশে,
যত্ন করে এনেছিলাম
পোষ মানাবার আশে।
অনেক আদর যত্ন দিয়ে
বড়ো করেছিলাম তাকে,
খারাপ কিছু দেখলে পরে
ঘেউ ঘেউ করে হাঁকে।

রকম সকম দেখে তার
নাম রেখেছিলাম বাঘা,
হঠাৎ করেই বিদায় নিল
দিয়ে মনে দাগা।
আচমকাই বাঘা একদিন
পড়লো চাপা বাসে
সেদিন থেকে ঠাকুমা শুধু
চোখের জলেই ভাসে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

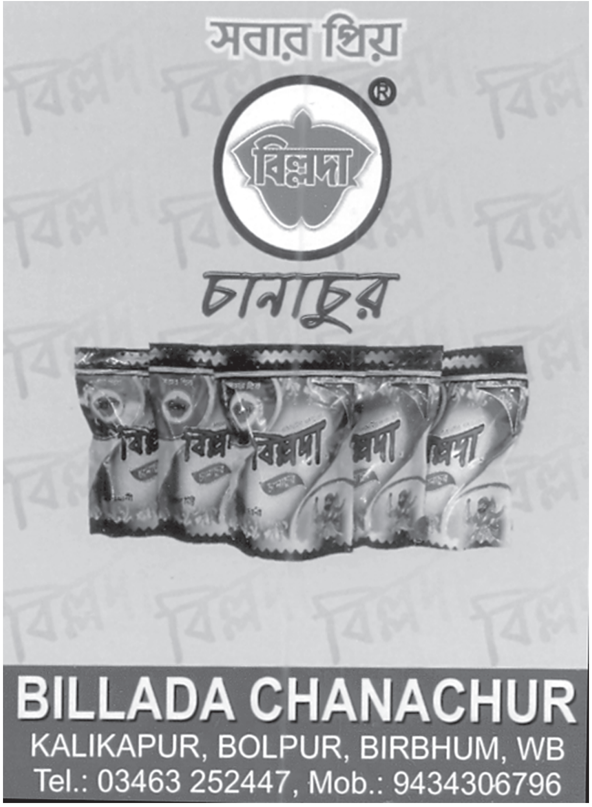

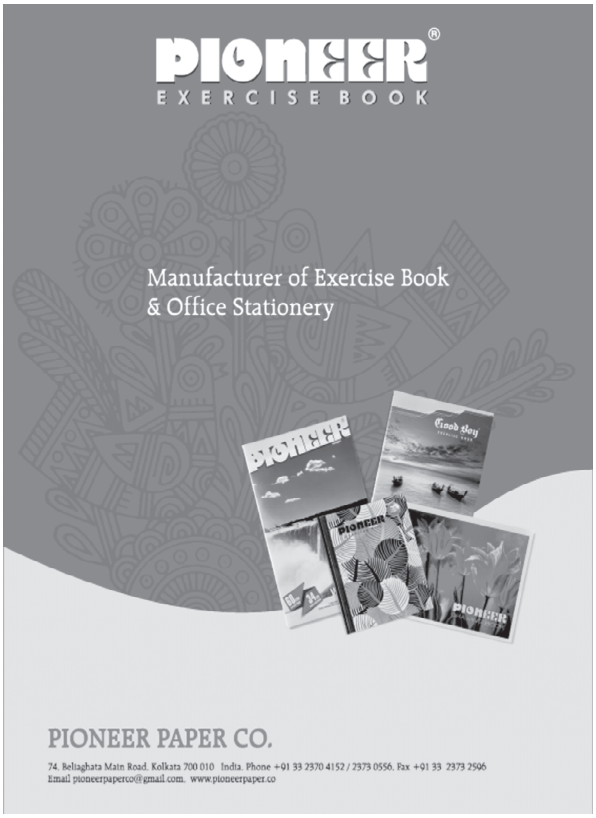

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিশ্বে ইসলামের বিপদ কি আসন্ন?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি জানা গেছে ভারতে স্মৃতি বেগম নামে এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মহিলা তার মুসলমান মজহব ত্যাগ করে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও আর এক মুসলমান পরিবারের ১৫ জন সদস্য দীর্ঘ ১৮ বছর পর হিন্দু সনাতন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এরা আগে সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এদের এক সদস্যার নাম ছিল গুলবাহার। তিনি এখন সংগীতা নাম গ্রহণ করেছেন এবং অন্যরাও নাম পরিবর্তন করেছেন।

এতো গেল দেশের কথা। বিদেশেও বহু মুসলমান পরিবার যাঁরা নিজের মজহব ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা পুনরায় নিজ পূর্বপুরুষের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাছাড়াও কতকগুলি দেশের সরকার ইসলাম মতাবলম্বী তথা মুসলমানদের ওপর সরকারিভাবে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ আরোপ করে চলেছে। সরকারি এই নিয়মের কারণে সে সমস্ত দেশের মুসলমানরা এখন অসহায় অবস্থায় রয়েছে। কীরকম পরিস্থিতিতে তারা সেদেশে রয়েছেন তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

সুদান প্রথম দেশ যেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ। দেখুন বিশ্ব কীভাবে ইসলামের শারিয়া আইনের বর্বরতার জন্য দ্রুত নিজেদের মত প্রকাশ করছে। ইউনাইটেড স্টেটস, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের বহু খ্রিস্টান যারা মুসলমান হয়েছিল তারা পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসছে। জাপান সবসময়ই তাদের দেশে স্থায়ীভাবে মুসলমানদের বসবাসের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে এবং তারা মুসলমানদের কোনোরকম ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া, কোনোরকম ব্যবসা এবং কোনোরকম ইসলামি আচার পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদি কোনো মুসলমান মৌলবি ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা প্রচার করে তৎক্ষণাৎ তাকে তার পরিবার-সহ সেদেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। কিউবা প্রথমেই মসজিদ স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল করেছে। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে অ্যাংগোলা এবং বিভিন্ন দেশ সরকারিভাবে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

নরওয়ে সে দেশে অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য প্রচুর সংখ্যক মুসলমানকে বহিষ্কার করেছে। মুসলমান অপরাধীদের বহিষ্কৃত করায় সেখানে বাহাত্তর শতাংশ অপরাধ কমে গিয়েছে। কারাদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী তাদের কারাকক্ষের অর্ধেক এখন ফাঁকা রয়েছে, আদালত কক্ষ প্রায় ফাঁকা, পুলিশকে এখন এই বিষয়ে আর নজর দিতে হচ্ছে না। প্রধানত তারা ট্রাফিক ব্যবস্থা, রাস্তা ও সড়ক রক্ষা এবং জনগণের সহায়তা দিয়ে চলেছে।

গত বছর মসজিদকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র জার্মানিতে ৮১টি হিংস্র আক্রমণ ঘটেছে। অস্ট্রিয়ান পুলিশ জিহাদি নিয়োগকারী সন্দেহে বহুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চীনের একটি আদালত ২২ জন মুসলমান ইমামকে ১৬-২০ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়েছে ইসলামি ঘৃণা ছড়ানোর জন্য। তার সঙ্গে ১৮ জন জিহাদিকে। চীন বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। পশ্চিম চীনের জিনজিয়াং-এ সরকারি ভবনে এবং বিদ্যালয়ে মুসলমানদের নামাজ বন্ধ করেছে। শতাধিক মুসলমান পরিবার তাদের নিরাপত্তার জন্য চীন থেকে তল্পিতল্পা গোটাচ্ছে তাদের নিজস্ব মধ্যপ্রাচ্য দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য।

মুসলমান উদ্বাস্তুরা উপলব্ধি করছে যে খ্রিস্টান দেশগুলি তাদের আশ্রয় দেবে না। কারণ তাদের হিংসাত্মক পথ এবং সিরিয়া ও ইরাকে নিয়মিত যুদ্ধ, আইএসএস-এর জঘন্য কাজ যারা যুবকদের হত্যা এবং মা ও কন্যাদের যৌনদাসী বানানোর জন্য।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব চরমপন্থীদের এবং তাদের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে ‘Anti-Social Behaviour Order’ তৈরি করার কথা ভাবছে। এমনকী নির্বাসন আইনও তৈরি হয়েছে।

ইসলামি উদ্বাস্তুদের খারাপ কাজের জন্য চেক প্রজাতন্ত্র তাদের দেশে ইসলামি উদ্বাস্তুদের অস্বীকার করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দেশ তাদের দেশে বিতর্কিত ‘Foreign laws which would include sharia law’— বৈদেশিক আইন যার মধ্যে শারিয়া আইন আছে তা সংশোধন করার সুপারিশ করেছে।

পোলিশ ডিফেন্স লিগ মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী জারি করেছে। ১৬টি রাজ্যে শারিয়া আইন বাতিলের জন্য আইন আনা হয়েছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের বহু মুসলমান সে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যেন স্থানীয় আইরিশদের ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজের থেকে দূরে রাখা যায়। সেই ঘোষণার পর বেলফার্স্ট নগরীতে একদল মুসলমানের উপর আক্রমণ নেমে আসে। স্থানীয় আইরিশরা দলবদ্ধ ভাবে মুসলমান যুবকদের ওপর নিষ্ঠুর আঘাত হানে। যারা যারা শারিয়া আইন মতে আইরিশ বালিকাদের হত্যা এবং গণধর্ষণের নিদান দিয়েছিল। এমনকী হাসপাতালকর্মীরা আঘাতপ্রাপ্ত মুসলমান রোগীদের চিকিৎসা করতেও অনিচ্ছুক ছিল। তদের মধ্যে

ফঃ ৬

অধিকাংশকেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

উত্তর ক্যারোলিনা ইসলামি শারিয়া আইন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, কারণ এটি সেখানে এখন মুসলমানদের অপরাধপ্রবণ করে তুলেছে।

একজন ডাচ এমপি নেদারল্যান্ডে থাকা সমস্ত মসজিদ সরানোর ডাক দিয়েছেন। ডাচ পার্লামেন্টের এক সদস্য বলেছেন— 'আমরা নেদারল্যান্ডকে ইসলাম মুক্ত করতে চাই।' ডাচ এমপি মাইকেল ডি গ্রাফ স্বাধীনতা সম্পর্কে দলের পক্ষে বলেছেন--- 'নেদারল্যান্ডের সমস্ত মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। ইসলাম মুক্ত নেদারল্যান্ড বসবাসের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে খুব সুন্দর এবং নিরাপদ দেশ হবে, যা মুসলমান উদ্বাস্তুদের আগমনের পূর্বের অবস্থার মতো।'

অন্যান্য দেশে মুসলমানদের প্রতি যখন সে দেশের সরকার এবং জনগণ কঠোর মনোভাব দেখাচ্ছে তখন আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে দেশের তথা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী রাজনৈতিক, সমাজকর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কীভাবে মুসলমানদের উস্কানি দিয়ে বর্তমান ভারতকে পুনরায় টুকরো টুকরো করে ভেঙে, হিন্দুদের সর্বনাশ করে দেশকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, দুর্গাপূজোয় বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে জেহাদিরা হিংসা ছড়িয়ে সে দেশের কুড়িটি জেলায় জঘন্যভাবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে লুঠ, খুন, গৃহদাহ, প্রতিমা ধ্বংস, মন্দির ধ্বংস করে বর্বরতার যে পরিচয় দিয়েছে তার জন্য বিশ্বের বহু দেশ থেকে প্রতিবাদ-ধিক্কার জানানো হলেও এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামক মোমবাতিওয়ালারা বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকরা ভোট হারানোর ভয়ে নীরব থেকেছেন।

এতো গেল বাংলাদেশের কথা। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক এই পশ্চিমবঙ্গেও দুর্গাপুজোর মধ্যে দু-এক জায়গায় হিন্দু মন্দিরে আঘাত করা হয়েছে, মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, মন্দিরের বাইরে মূর্তি ফেলে দেওয়া হয়েছে তা অনেকেই জানেন না। কারণ সরকার তা জানতে দেয়নি। কেন? সহজ উত্তর তোষণ।

সেই ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই মোহনদাস গান্ধীর হাত ধরে যে তোষণ ভারতে শুরু হয়েছিল তা আজও প্রবলভাবে বজায় রয়েছে। সেই তোষণের ধারাবাহিকতা একটু দেখে নেওয়া যাক—

(১) গান্ধী-নেহরুর সহযোগিতায় ইসলামের দাবি মেনে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করার পরেও বিষবৃক্ষটির মুলোচ্ছেদ করা হলো না। প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে এদেশে রেখে দেওয়া হলো। তোষণের মাধ্যমে তাদের অন্যায় সুযোগ দান ও দ্রুত বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে পুনরায় আর একটি 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করার জন্য সংবিধানে আনা হয়েছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামক এক অভিশপ্ত তত্ত্ব। তার ফলে এবং জলস্রোতের মতো অনুপ্রবেশের কারণে হিন্দুর দেশ ভারতে আজ ২০ কোটিরও বেশি মুসলমান।

(২) ভারতের সংস্কৃতি ও সৃজনী শক্তির অনুপ্রেরণা হলো সংস্কৃত ভাষা। অতীতে বহু শতবর্ষ ধরে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু গান্ধী-শিষ্য নেহরু বললেন— 'সংস্কৃত হলো একটি মৃত ভাষা।' তাই শিক্ষায় সংস্কৃতকে ব্রাত্য করে নিয়ে আসা হলো উর্দুভাষাকে।

(৩) নেহরু-গান্ধী পরিবারের সরকারের বকলমা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন— 'জাতীয় সম্পদে মুসলমানদের থাকবে অগ্রাধিকার।'

(৪) 'অশুভ ধর্মনিরপেক্ষচক্র' মুসলিম তোষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই নিযুক্ত হয়েছে সাচার কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ মতে কেন্দ্র সরকার পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিচ্ছে যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় অনধিক ২ লক্ষ টাকা। আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুসলমান ছাত্রদের বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা স্কলারশিপ ঘোষণা করা হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের পরিবারের ছাত্রদের।

৫। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার ইমামকে ২৫০০ টাকা বেতন দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। পরে তা আরও বেড়েছে। ইমামদের কাজ কী? মসজিদে কোরান পাঠ করা। যে কোরান সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী William Gold Stone শতবর্ষ আগেই পার্লামেন্টে কোরান হাতে নিয়ে বলেছিলেন, 'যতদিন এই বইখানি আছে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না— So long as there is this book, therewill be no peace in the World.'

তোষণের আরও অসংখ্য নিদর্শন আছে। সরকার যদি অন্যান্য দেশগুলোর মতো এখনও কড়া কোনো ব্যবস্থা না নেয় তবে ভবিষ্যতে এই ভারতের হিন্দুদের উদ্বাস্তু হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

ত্রিসন্ধ্যা ধর্মনিরপেক্ষতার বীজমন্ত্র জপ করে হিন্দু আজ নপুংসকে পরিণত হয়েছে। প্রতিরোধ বা প্রতিবাদেরও সাহস নেই। কিন্তু শঙ্কিত। দেশ কি পুনরায় বিভক্ত হবে? ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৬২-৬৪ এবং পরবর্তী কিছু বছরের মতো কি পুনরায় হিন্দু রক্তে প্লাবিত হবে? কোনো অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে, তার যে কী পরিণতি হবে— হিন্দুশূন্য কাশ্মীর ও দেগঙ্গা (উত্তর ২৪ পরগনা) তার নিদর্শন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তোষণ করে কংগ্রেসের এই সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই এই রাজনীতি কংগ্রেস শুরু করেছিল। খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এই সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার তাসটি খেলেছিলেন গান্ধী স্বয়ং। যার বিরোধিতা করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কংগ্রেসের ওই রাজনীতির সমালোচনা করে বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন— 'এই তোষণ-নীতি হিন্দুদের একই ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে যা হিটলারের প্রতি তোষণের নীতির পরিমাণ হিসেবে মিত্রশক্তিকে ভোগ করতে হয়েছিল।' সেই কংগ্রেসের গর্ভজাত এক রাজনৈতিক দলের নেত্রীর তোষণ যে কী মারাত্মকভাবে বেড়েছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কেন্দ্র সরকারকে যে কোনো কড়া ব্যবস্থা নিতেই হবে। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। □

স্মরণে

আমার ভরসার কেন্দ্র ছিলেন খোকাদা

খোকাদাও (জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী) চলে গেলেন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। বাঙ্গলায় সঙ্ঘকার্যের এক একজন স্থপতি ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছেন। একদিন-দুদিন পরপরই এমন খবর শুনি, পড়ি। বিষাদগ্রস্ত মন শুধু শক্ত করে স্মৃতিটুকু আঁকড়ে ধরে আর ছবি আঁকে তাঁদের ভালোবাসা, প্রেরণা ও সাহচর্যের কথার। নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে গেলে যাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন তাঁদের মধ্যে খোকাদা ছিলেন অন্যতম। খুবই ভালোবাসতেন, নিরন্তর খবরাখবর নিতেন। ১৯৬৯-৭৩-এ বোলপুরে দীর্ঘকালীন বিদ্যার্থী বিস্তারক হিসেবে ছিলাম, তখন খোকাদা বীরভূম ভ্রমণে এলে তাঁর ভ্রমণ সঙ্গী ছিলাম আমি। এটাই ছিল একরকম তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

জরুরি অবস্থা শুরুর (১৯৭৫) প্রথম কী দ্বিতীয় দিনেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা পৌঁছেছিলাম— শিশুমন্দির শুরু করার কাজে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহে। সঙ্ঘ কার্যালয় ২৬ নম্বরের কাঠের সিঁড়িতে পা দিতেই দেখি পুলিশ পাহারা। বলল--- উপরে যাওয়া যাবে না। কলকাতায় আর কিছু চিনি না, কী করি কোথায় যাই। শুধু খোকাদার বাড়ির ঠিকানা ছিল। উল্টোডাঙা গিয়ে খুঁজে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। খোকাদা ও বউদির অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়ে মনে হলো যেন নিজের দাদার কাছেই এসেছি। প্রথম দর্শনেই তিনি যেন তাজ্জব হয়ে তার স্বভাবজাত কৌতুক মিশ্রিত স্মিত হাসির ভঙ্গিতে বললেন— 'সে কী, এই এমার্জেন্সির মধ্যে তুমি কলকাতা এসেছো কেন'! আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম— 'শিশুমন্দির (তখন শিশুতীর্থ নাম হয়নি) শুরু করতে কিছু জিনিসপত্র দরকার যা শিলিগুড়িতে পাওয়া যাবে না। ২৬ নম্বরে উঠতে গিয়ে দেখি পুলিশ।' এবার কপট ক্ষোভ দেখিয়ে বললেন— 'বেশ হয়েছে, ভাগ্য ভালো পুলিশ হেপাজতে যাওনি। এখন কদিন এখানে থাকো, দেখা যাবে কী কী দরকার। এ কদিন দোতলায় বাবার পাশের ঘরে তোমার আস্তানা।'

খোকাদার বাবা-মা'র স্নেহ আশীর্বাদও কম পাইনি। যে কদিন ছিলাম বউদির কথা বলার নয়, নিজের বড়ো দিদির মতো স্নেহভরে পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন— এসব কথা আজ ভুলি কী করে! সত্যি কথা বলতে জরুরি অবস্থার অর্থটাই তখন বুঝতাম না। খোকাদার কাছে তার ভয়াবহতার কথা প্রথম শুনলাম। তিন-চারদিন ছিলাম। খোকাদা সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন। আমি তো কলকাতার বিষয়ে তখন নিরক্ষর। দোকান খুঁজে খুঁজে শিক্ষণ সামগ্রী কিনেছি। তার আগে ১৯৪৭-এ লক্ষ্ণৌতে যখন প্রশিক্ষণে ছিলাম— একা, জীবনে প্রথম অজানা জায়গায়। খোকাদা একবার গিয়েছিলেন। আমাকে ডেকে খোঁজ খবর নিয়েছেন। মনে যেন ভরসা পেয়েছিলাম। জরুরি অবস্থার মধ্যে সত্যাগ্রহের পরে জেল থেকে এসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বে কলকাতা থাকাকালীন নিয়মিত তাঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। পরামর্শ নিতাম, সমস্যার সমাধান চাইতাম। প্রথম 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা' প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। তিনি ছিলেন আমার একটা ভরসা কেন্দ্র। শিলিগুড়ি শিশুতীর্থেও কয়েকবার এসেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরে যোগাযোগ কম হতো। শেষ ২০১৮ সালের মাঝামাঝি কলকাতা গিয়ে পরিকল্পনা মতোই ফোন করে বাড়িতে গেলাম। অনেক বছর পর। সঙ্গে ছিলেন বোলপুরের অনুপ দাশগুপ্ত (স্বয়ংসেবক, কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা)। বউদির শরীর খারাপ তার মধ্যেও তিনি আমাদের জন্য ঘুগনি করে রেখেছিলেন। ঘণ্টাখানেক বসে পুরোনো দিনের কথাবার্তা হলো; এটাই শেষ সাক্ষাৎ। ২০২০-তে বউদির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ফোনে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। খোকাদা একদিকে যেমন ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী অপরদিকে তাঁর রসবোধও ছিল অনন্য। একবার কোনো বৈঠকের শেষে টাকা দিয়ে মিষ্টি বা খাবার আনতে বললেন। প্রস্তাবিত সামগ্রী কিনে এনে টাকা ফেরত দিতেই বেশ এক ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'তুমি একটা না, টাকা ফেরত আনতে বলেছি?' বুঝলাম, আবার গেলাম। কিন্তু নকল বকাটাকে বেশ হৃদয় দিয়ে উপভোগও করেছিলাম। বাসনা হয়েছিল ওরকম অনেক বকা শোনার।

বৌদ্ধিক বা বৈঠকে খোকাদা অনেক উদ্ধৃতি দিতেন, বিশেষ করে রবীন্দ্র কবিতা। এরকম শিলিগুড়ির একটি বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সতর্কতায় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার অংশটি উল্লেখ করেছিলেন— 'আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে / ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে / ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ / ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ'। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে শোনা, প্রথম শুনেছিলাম, আজও মনে আছে (জানিনা ভুল আছে কিনা)। মনে আছে সাধারণ কথার মধ্য দিয়ে গভীরে পৌঁছবার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতার নানা উদাহরণ। আজ তাঁর অমরলোকে যাত্রার সমাচারে বিষাদে ভারাক্রান্ত মন। আমার মতো সাধারণ একজন স্বয়ংসেবকের প্রতি এতো ভালোবাসা মানুষটিকে সংক্ষিপ্ত স্মৃতি কথার মধ্য দিয়েই নিবেদন করলাম। সেই অদৃশ্য স্থানে জানালাম আমার শত শত প্রণাম।

***বিমলকৃষ্ণ দাস**, জোড়পাকড়ী, জলপাইগুড়ি (শিলিগুড়ি)*

ভারত সরকারের 'দেউলিয়া বিধি'

শেখর সেনগুপ্ত

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি বিগত এক দশক সময়ে যে সমস্ত ইতিবাচক আইনকে বলবৎ করেছে, 'দেউলিয়া বিধি (Insolvency and Bankruptcy Law) তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষত ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এই নীতির বলিষ্ঠ প্রভাব ক্রমেই অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি ছিলাম ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একজন পদস্থকর্মী— Staff College-এর Faculty। তাই বিষয়টি নিয়ে বিশদ চর্চা করবার উৎসাহ আমার স্বাভাবিক। ভারত সরকার অনেক বিচার-বিবেচনার পর ২০১৬-১৭ সালে দেশে 'দেউলিয়া বিধি' কার্যকর করেন। এই আইন লাগু হওয়ার আগে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ঋণের টাকা উদ্ধারের পথ ছিল বহুলাংশে কণ্টকাকীর্ণ। তখন বারো রকমের আইন বলবৎ ছিল ব্যাঙ্কের সামনে বকেয়া টাকা উদ্ধারে। সেই আইনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Contracts Act, Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, Scrutinization and Reconstruction of Financial Acts এবং Enforcement of Security Interest Act। অতগুলি আইন থাকা সত্ত্বেও কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছিল না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রায়শ বিপন্ন হয়ে পড়ত অনাদায়ী টাকা উদ্ধার করতে না পেরে।

দেউলিয়ারূপে চিহ্নিত লোকদের কাছ থেকে অনাদায়ী অর্থের উদ্ধার বন্ধ করবার জন্য যে কয়েকটি আইন এই দেশে কার্যকর, তাদের মধ্যে প্রধানটির পরিচয় যে নামে, তা হলো Provincial Insolvency Act। এই কানুনটির বয়স একশত বছর অতিক্রম করল এই ২০২২ সালে। ভারতের বর্তমান সরকার তথাকথিত দেউলিয়ারা যাতে গা বাঁচাতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে চালু করেছেন Debt Recovery Tribunal Act। এই আইনে কিন্তু কোনও সংস্থা দেউলিয়া হয়ে পড়লে তার পুনরুজ্জীবনকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য দানের কথাও বলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে এই দেশের কোনও সরকারি প্রক্রিয়াতেই প্রতিফলিত হয়নি। বর্তমানে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াকে সুচারুরূপে বাস্তবায়িত করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন দেশের বিশেষজ্ঞ পেশাদাররা যথা আইনজীবী, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিধারী, চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট প্রমুখ।

আজ দেশের দেউলিয়া বা সম্পদশূন্যতার বিষয়কে দেখভালের জন্য তৈরি হয়েছে একটি বিশেষ অফিস— নাম যার Insolvency and Bankruptcy Board of India। এরাই দেউলিয়াদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে থাকে। এর বিপরীতে রয়েছে আবার ঋণদাতাদেরও সংগঠন, যাদের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দিতে সচেষ্ট ভারত সরকার। কোনও সংস্থা যদি অর্থাভাবে ভেঙে পড়ে, তার অবশিষ্ট সম্পদকে কীভাবে ভাগ করা হবে, তার পরিচ্ছন্ন উল্লেখ রয়েছে দেশের বর্তমান দেউলিয়া বিধিতে। সরকারি মদতে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ঋণদাতারা তাঁদের প্রাপ্য পুরোটাই ফেরত পাচ্ছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে জটিলতা এবং বিতর্ক দেখা দিতেই পারে। যেমন গৃহনির্মাণে রত প্রোমোটারদের একাংশের কার্যধারায় অনুল্লেখ থাকছে বসতবাটি ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার কথা। এই নিয়ে সামান্য আন্দোলনও হয়েছে। তারপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন এফ ফর্ম বা নির্দেশপত্র পূরণের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট আবাসন ক্রেতাদের দাবিদাওয়া পেশ করতে বলছে। কিন্তু তবুও পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি। বিপরীত চিত্র ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে। ২০১৮ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার জারি করে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ,— পরে যা পরিচিতি অর্জন করেছে Banking Regulation Act-এর একটি অংশ রূপে। ওই আইন বলবৎ হবার পর এদেশে ব্যাঙ্কের ঋণখেলাপ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির দেউলিয়া হয়ে পড়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে নতুন গতি এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েকটি ব্যাঙ্কের অফিসে গিয়ে এই তথ্যের স্বপক্ষে সাবুদও পেলাম। এক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্রের অর্থদপ্তর।

নিজ অভিজ্ঞতায় জানি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট অনুৎপাদক সম্পদের বারবাড়ন্ত কত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বকেয়ার পরিমাণকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না, সেগুলি হলো বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত শিল্প, সড়ক পরিকাঠামো ও বিদ্যুৎ। আমি এখানে সেই সকল খাতকদের মধ্য থেকে এক ডজন এমন ঋণ-খাতকদের নাম তুলে ধরলাম, যাঁরা দেশের ব্যাঙ্কগুলির তাবৎ অনুৎপাদক সম্পদের ২৫ শতাংশের জন্য দায়ী :

(১) ভূষণ স্টিল, (২) এ বি জি শিপ ইয়ার্ড, (৩) মনেট ইস্পাত, (৪) ল্যানকো ইনফ্রা, (৫) জ্যোতি স্ট্রাকচারস, (৬) এরা ইনফ্রা, (৭) অ্যামটেক অটো, ৯৮) ভূষণ পাওয়ার, (৯) জেইপে ইনফ্রাটেক, (১০) অলক ইন্ডাস্ট্রিজ, (১১) এসার স্টিল, (১২) ইলেকট্রোস্টিলস।

এই বারোটি সংস্থার কাছে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পাওনা ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এরা সকলেই দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়েছে। চলছে শত শত মামলা। কিছু আদায় হচ্ছে নিলাম-টিলাম ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে। সেখানেও রয়েছে একটি বড়ো সমস্যা। দেখা গেছে, বহু ক্ষেত্রে ঋণখেলাপি উদ্যোগপতিরা নিজেরাই দেউলিয়া মামলার অন্তিমপর্বে নিজেদের সম্পদকেই নাম ভাঁড়িয়ে কম দামে কিনে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং সফলও হচ্ছেন। এই চক্রকে থামাতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। □

তিন মাসেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করবে আয়ুর্বেদ, নয়া সাফল্য গবেষণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আয়ুর্বেদে মাত্র তিন মাসেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব ডায়াবেটিস। গবেষণালব্ধ ফলেই উঠে এল এই তথ্য। শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ আয়ুর্বেদিক ওষুধ। তাই আধুনিক বা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মতোই ধীরে ধীরে রোগ নিয়ন্ত্রণ তথা সেরে ওঠার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক ওষুধে আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। হালফিলের গবেষণায় দেখা গেছে, আয়ুর্বেদের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ভারতে এখন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ। আগামী ২০৪৫ সালে তা পৌঁছাবে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষে। এখনই সচেতন না হলে ভারত ডায়াবেটিসে অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলবে। তাই অ্যালোপ্যাথির বাইরেও কীভাবে আয়ুর্বেদে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় তারই গবেষণায় দারু হরিদ্রা, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠার মতো ভেষজ উদ্ভিদ থেকে তৈরি 'বিজিআর-৩৪' ওষুধ নিয়ে গবেষণা করে আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানগুলো। দেখা যায়, ১২ সপ্তাহে চমকপ্রদভাবে কমছে রক্তে সুগারের মাত্রা। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে একাংশকে দেওয়া হয় কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল রিসার্চের (সিএসআইআর) আবিষ্কারে তৈরি আয়ুর্বেদিক 'বিজিআর-৩৪'। অন্য অংশের উপর প্রয়োগ করা হয়, 'সাইট্যাগলিপটিন'। দেখা যায়, 'বিজিআর-৩৪' কাজ করছে অপেক্ষাকৃত বেশি। খালিপেটে অথবা খাবার পর, দুটি ক্ষেত্রেই কমছে সুগারের মাত্রা। এই গবেষণার সুফল হাতে পেয়েই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে কেন্দ্র।

বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে কোভিড পর্বে আয়ুর্বেদিক দাওয়াই বেশ কার্যকর হয়েছে। বিদেশেও চাহিদা বেড়েছে আয়ুর্বেদের। শুধুমাত্র হলুদেরই চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে আগের চেয়ে ১১৬ শতাংশ। পাশাপাশি গুলঞ্চ, তুলসী, দারুহরিদ্রার মতো ওষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ তো আছেই। কিছুদিন আগেই চিকিৎসকদের একাংশ গুলঞ্চর বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু গবেষণায় তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। এমনকী কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি। তাই গুলঞ্চকে 'সঞ্জীবনী ঔষধি' বলে সরকারিভাবে বর্ণনা করেছে আয়ুষ মন্ত্রক। রিপোর্টে প্রকাশ গুলঞ্চ থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়, তার কোনো বিষাক্ত প্রভাব নেই। উলটে, পেটের সমস্যার উপশম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুলঞ্চ অত্যন্ত কার্যকর।

সেবির প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান হলেন মাধবী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের প্রথম মহিলা হিসেবে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন মাধবী পুরী বুচ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার

নিয়োগ কমিটি মাধবীর নাম অনুমোদন করে। তাঁর আগে ওই পদের দায়িত্বে ছিলেন অজয় ত্যাগী। ২০১৭ সালে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন। সম্প্রতি তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে। তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হলেও, পরে অজয় ত্যাগীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হলেন মাধবী। এর আগে সেবির (সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) আজীবন সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন ৫৫ বছরের মাধবী পুরী বুচ।

সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর মাধবী আমেদাবাদের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট থেকে এমবিএ করেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। একাধিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বও সামলেছেন। সেবির নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে কাউকে নিয়োগ করা যায়।

দানাশস্য উৎপাদনে ভারত স্বনির্ভরের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রোটিনের সবচেয়ে পুষ্টিকর এবং সহজ উৎস হলো ডাল। তাই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অংশ হিসেবে সরকার জনসাধারণের পুষ্টির উন্নতির জন্য গম এবং চালের পাশাপাশি বিনামূল্যে ডালের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে। আশা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রতি বছর ডাল খরচ হবে ৩.২ মিলিয়ন টন। ডালের সিংহভাগ ভারত বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ডাল উৎপাদন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। একদিকে, সরকার বিজ্ঞানীদের ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল এবং বীজ বিকাশের আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে কৃষকদেরও ডাল চাষে উৎসাহিত করা হয়েছে। সারা দেশে প্রায় ১৫০টি দানাশস্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডালের এমএসপি ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৩ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে ডাল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ সালের চতুর্থ অগ্রিম অনুমান অনুসারে, দেশের ডাল উৎপাদন ২০১৩-১৪ সালে ১৯২.৭ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২৫৭.২ লক্ষ টন হয়েছে। প্রতি বছর ডালের আমদানি হ্রাস পেলে দেশ ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় করবে।

আবার চাঙ্গা হয়েছে দেশের কর্মক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের তরুণদের জন্য সুখবর। চাকরি প্রার্থী তরুণদের কাছে ২০২২ সালের প্রথম মাস সুখবর নিয়ে এসেছে। কারণ দেশের বিভিন্ন সেক্টরে বহু তরুণদের নিয়োগ করা হচ্ছে। 'নকরি জবস্পিক ইনডেক্স' অনুসারে, জানুয়ারি মাসে নিয়োগ রেকর্ড ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে সূচক ২৭১৬-এই উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ছিল ১৯২৫। প্রাথমিকভাবে আইটি-সফ্টওয়্যার, খুচরো এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র খুবই আশাবাদী ছিল। ২০২১ সালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির লক্ষণ স্পষ্ট। টেলিকম (৪৮ শতাংশ), খুচরো (৫৮ শতাংশ), আইটি সফ্টওয়্যার (৮০ শতাংশ), শিক্ষা (৩১ শতাংশ), ফার্মা (২৯ শতাংশ), চিকিৎসা/স্বাস্থ্যসেবা (১০ শতাংশ), তেল ও গ্যাস/বিদ্যুৎ (১০ শতাংশ)। অন্যান্য শিল্প, যেমন বিমা (৮ শতাংশ), এফএমসিজি (৭ শতাংশ) এবং উৎপাদনে (২ শতাংশ) আগের বছরের তুলনায় নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'পুনর্নির্মাণ জাদুঘর'-এর বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশের গৌরবময় ইতিহাস, দেশের জনগণ, সংস্কৃতি এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করাতে হায়দরাবাদে দুই দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের এই আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের 'রিইমেজিনিং মিউজিয়ামস ইন হায়দরাবাদ' অনুষ্ঠানটি ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিশাহী, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার মতো দেশের নাগরিকরা অংশগহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি যোদ্ধাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকার দশটি জাদুঘর নির্মাণ করছে। এছাড়াও সরকার বিশেষ জাদুঘর যেমন বস্ত্র ও কারুশিল্প জাদুঘর, প্রতিরক্ষা জাদুঘর এবং রেলওয়ে জাদুঘরগুলির উন্নতির জন্য সাহায্য করছে। ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত সংস্কৃতি মন্ত্রক সারা দেশে ১১০টি জাজুঘরকে অর্থায়ন করেছে এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশ তৈরি করতে আঠারোটি বিজ্ঞান জাদুঘরের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, মন্ত্রকের অধীনে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগও সারা দেশে ৫২টি জাদুঘর পরিচালনা করছে।

এই প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ পাটনা থেকে গুয়াহাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পৃথিবীর সকল আদিম সভ্যতাই নদী তীরবর্তী স্থানে গড়ে উঠেছিল। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সেই সব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। একটি বিশাল দেশে সংযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো নদী। তথাকথিত পরিবহণের বিকল্প হিসেবে জলপথ সস্তা হলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত জলপথের উন্নয়নে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। ২০১৬ সালে 'ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ অ্যাক্ট' প্রবর্তনের ফলে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান মোটেও সহজ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অগ্রাধিকারের ফলে এখন এই অঞ্চলের জলপথের উন্নতি হচ্ছে। এমভি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নামক পণ্যবাহী জাহাজ ৫ ফেব্রুয়ারি বিহারের পাটনা থেকে ২০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য নিয়ে গুয়াহাটির পাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। এই পণ্যবাহী জাহাজটি ২৩৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে, জাতীয় জলপথ-১ (গঙ্গা নদী) ধরে ভাগলপুর, মনিহারি, সাহেবগঞ্জ, ফারাক্কা, ত্রিবেণী, কলকাতা, হলদিয়া হয়ে, হেমনগর যাবে। ভারত বাংলাদেশ প্রোটোকল পথ ধরে খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চিলমারি এবং জাতীয় জলপথ ২ ধরে ধুবরি এবং জোগিঘোপা হয়ে যাবে। সমুদ্রযাত্রা শেষ করতে জাহাজটির ২৫ দিন সময় লাগবে এবং মার্চের শুরুতে পাণ্ডুতে পৌঁছাবে।

অটল টানেল বিশ্বের দীর্ঘতম হাইওয়ে টানেল হিসেবে স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের দীর্ঘতম ট্র্যাফিক টানেল হিসেবে ভারতের অটল টানেল, রোহতাংকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,০৪৪ ফুট উচ্চতায় সুড়ঙ্গটি নির্মাণ করা হয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য ৯.০২ কিলোমিটার। 'বর্ডার রোজ অর্গানাইজেশন' প্রায় দশ বছর সময় ধরে হিমালয়ের পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গের নির্মাণ করেছে। ২০০২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী লাহুল-স্পিতির জনজাতি জেলা সদর দপ্তর কেলং-এ টানেলটির নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন। এরপরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল ধরে স্থগিত এই প্রকল্পটি ২০২০ সালে শেষ হয়েছিল। এর ফলে মানালি এবং লেহ-এর মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। একইসঙ্গে এই পথে যাত্রার সময়ও অন্তত পাঁচ ঘণ্টা কমেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রথম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে'র সঙ্গে যুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল হওয়ার পরে জম্মু ও কাশ্মীর দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেখানকার সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র মানুষরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সম্প্রতি 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল ইউন্ডো সিস্টেমে' যোগদানকারী দেশের প্রথম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালের বাজেটের সময় কেন্দ্রীয় সরকার এটি ঘোষণা করেছিল। 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল ইউন্ডো সিস্টেম' একটি ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। এটি বিনিয়োগকারীদের শনাক্তকরণ এবং তাঁদের ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। 'ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল ইউন্ডো সিস্টেমে'র সঙ্গে যুক্ত। এটি জম্মু ও কাশ্মীরে ৪৫টি শিল্প পার্ক অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে উপলব্ধ প্লটগুলির শনাক্তকরণ সহজ করে তুলবে।

এখন আর বিনিয়োগকারীদের তথ্য সংগ্রহ করতে এবং বিভিন্ন অংশীদারিদের কাছ থেকে অনুমোদন পেতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে না। জম্মু ও কাশ্মীরে বিনিয়োগের নতুন পথ খোলার ফলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৬।।